গ্রামোন্নয়ন কথা

এপ্রিল - জুন ২০১৮ অষ্টাদশ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদনা ঃ অমৃতলাল পাড়ুই

বিষয় তালিকা	লেখক	পৃষ্ঠা
১. 'তিলপী-ধোষা' প্রত্ন-উৎখননের প্রেক্ষাপট	কৃষ্ণকালী মণ্ডল	১
২. দেশ গড়তে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা	স্বপন মুখোপাধ্যায়	৯
৩. ব্যক্তিত্বের নিরিখে রাণি রাসমণি	ড. শিশুতোষ সামন্ত	১৯
৪. গাজীমেলা ঃ বড়খাঁ গাজীর কাল ও পরিচয় প্রসঙ্গে	দেবীশংকর মিদ্যা	২৮
৫. কিছু ছড়া ঃ চেহারা ও ঐতিহাসিক পটভূমি	ড. বলাইচাঁদ হালদার	৪১
৬. পুতুলনাচে যন্ত্র প্রযুক্তি	অমৃতলাল পাড়ুই	৪৪
৭. আশির কবিতা ঃ প্রতিবাদ যখন কবিতা	রাণা চট্টোপাধ্যায়	৪৬
৮. হাতির পিঠে হাওদা	শ্রীজীব গোস্বামী	৫০
৯. স্বতন্ত্র নাগরিক চেতনার কবি সমর সেন	সৌম্য সেনগুপ্ত	৫৩
১০. উন্নয়ন সাংবাদিকতা	সুব্রত কুণ্ডু	৬০
১১. আবুল বাসার ও 'টিল' গ্রন্থ	আনসার উল হক	৬৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ আগুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ
পোঃ - সাধুরহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৫০৪
মোঃ- ৯৭৩২৮৪৮৭২৮, email : agpamrita@gmail.com

সম্পাদকীয় . . . . .

আমরা যখন সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় মশগুল হয়ে থাকি, তখন আমরা কখনও বা ভেবে থাকি কারা আমাদের সৃষ্ট রচনার রস আস্বাদন করছেন। তাঁদের অনুভূতির জগতের সংগে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের সৃষ্টি মিশে যায়। এ খবর যখন আমরা জানতে পারি তখন বহুগুণ উৎসাহিত হই। আমরা তখন বুঝতে পারি যে আমাদের সৃষ্টির গুণমান বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাবতে বড় ভাল লাগে। কিন্তু নেশার সংগে পেশাদারিত্ব না থাকলে বাস্তবে ভাবনাগুলো কেমন যেন ভেসে বেড়ায়। সংগতি না থাকায় দুঃখবোধ জাগে, বেদনা পাই, অপরের কাছে হতাশার কথা বলে বেড়াই। কে কোথায় কী রচনা প্রকাশ করছেন, বিষয়বস্তু কী, এ রচনা কত লোকের উপর প্রভাব ফেলেছে, আমি নিজে এসব কতটুকু জানি, অন্যের রচনায় আমার প্রতিক্রিয়া কী — এগুলো কি আমরা ভেবে দেখি ? অন্যের রচনায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশে অভ্যস্ত না হলে অপরেই বা আমার রচনা সম্বন্ধে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতে আগ্রহ প্রকাশ করবে কেন ? ইচ্ছা থাকলে এসব ব্যাপার ভেবে দেখতে পারি, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সংগে যোগাযোগ রেখে এসব খোঁজ করতে পারি — একটু পরিশ্রম করে। আমরা কি চাই বিভিন্ন স্থানীয় পত্রপত্রিকায় আমার সৃষ্টি প্রকাশিত হোক ? চাইলে নিশ্চয়ই স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য আমার জানা দরকার — নিয়মিত খোঁজ খবর রাখা দরকার। তাহলে প্রয়োজনীয় জায়গায় আমার রচনা প্রকাশ করার সুযোগ থাকে। আমি কি চাই আমার রচনা মান উন্নত হয়ে উন্নতমনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক ? তাহলে তো আমার পছন্দ মতো নির্দিষ্ট বিষয়ে রচনার সৃষ্টির একটা পরিকল্পনা করতে হবে এবং তা পরিচিত মহলে শুনিয়ে প্রতিক্রিয়া জানার আয়োজন করতে হবে। এসবের জন্য সাংগঠনিক প্রক্রিয়া খুব সহযোগী হতে পারে। আমরা কি চাই সাধারণ জনমানসে স্রষ্টা হিসাবে আমাদের পরিচিতি গড়ে উঠুক। তাহলে বিভিন্ন স্কুলে, পাড়ায়, সভাসমাবেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নতুন নতুন স্রষ্টা-শিল্পীদের রচনা গান-পাঠ-আবৃত্তি-নাটকের মাধ্যমে দেখাবার ও শোনাবার ব্যবস্থা না করে একটা যুগ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্রষ্টার শিল্প-সংগ্রহ প্রচারে নিজেরাই আবদ্ধ থাকি কেন ? আমাদের নিজেদের সৃষ্টি প্রচারের উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভায় হতাশার আলোচনা করি, কিন্তু বহুক্ষণ আমরা আনন্দে বহুল প্রচারিত নির্দিষ্ট শিল্পীদের ক্যাসেটবন্দী গান-আবৃত্তি শুনবার ব্যবস্থা করি। তথাপি নিজেদের রচনা সাধারণ ক্যাসেট রেকর্ড করে গান, নাটক বা শ্রুতিকথা বাজিয়ে শোনাবার উদ্যোগ নিই না। এমনি সব সভাস্থলে যে গান গাওয়া হয় তা-ও নিজেদের রচনার প্রচারে কোন মতেই নয়। অথচ আমরা মনে করি আমাদের সৃষ্টির প্রচার হয়ে সমাজে আমাদের পরিচিতি ঘটুক। কোন কিছুই উদ্যোগ ছাড়া, পরিকল্পনা ছাড়া, পরিবেশনা ছাড়া বাস্তবে সফল হয় না। তাই আমাদের গতিবিধি দেখে মনে হয় আমরা সজ্ঞানে চাই না যে, আমাদের রচনা জনমানসে নিয়ে আসা হোক। দুঃখ প্রকাশই আমাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আপন খেয়ালে সৃষ্টি করার সংগে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্খার কোন যোগাযোগ নেই। এই ভাবালুতার পথ ছেড়ে রূপকল্পের বাস্তব রূপায়ণে সাংগঠনিক পদ্ধতিই সঠিক পথে আলো দেখাবে।

'তিলপী-ঘোষা' প্রত্ন-উৎখননের প্রেক্ষাপট

কৃষ্ণকালী মণ্ডল

সূচনা ঃ

বর্তমান পিয়ালী নদী খুব বড় নয়। প্রবাহপথও হাজা-মজা। বেশীর ভাগই জলাভূমি, বনজঙ্গলময় ছিল। বেশ কিছু অংশ সুন্দরবনের অর্ন্তভুক্ত এবং এ কালে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে আবৃত হয়ে পড়ে ছিল। পর্তুগীজ, মগ, বর্গী প্রভৃতি জলদস্যুদের অত্যাচারে এই নদী অববাহিকার গ্রামগুলি তথা জনবসতি শেষবারের মত জনশূন্য হয়ে পড়ে। স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা নির্বিশেষে নির্বিচারে হত্যা, গুহাদিতে ও ধানের গোলায় অগ্নিসংযোগে, লুটপাট, অবাধে অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা চলেছিল। মানুষ দেশ গাঁ ছেড়ে পলিয়েছিল। যারা পারেনি তাঁদের হয় মরতে হয়েছিল, না হয় 'দাস' হিসাবে দেশ-বিদেশের বাজারে বিক্রী হতে হয়েছিল। ফলে আবার সমগ্র অঞ্চল বনাঞ্চলে পরিণত হয়ে অনাবাদী হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বা তার কিছু আগে থেকে আবার আস্তে আস্তে জঙ্গল কোর্টে অঞ্চল তৈরি হতে থাকে; চাষবাসের জমির প্রসার লাভ ঘটতে থাকে।

পিয়ালী নদী অববাহিকায় তথা সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবন অঞ্চলকে বার বার এই উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ধ্বংসের কারণে, কখনো রাজনৈতিক কারণে, কখনো বা মানবের দানবীয় কার্যকারণে।

পিয়ালী নদীর উৎস ও তার অববাহিকা অঞ্চল

উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়োয়ার পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ সীমানা নির্দেশ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ভাঙড় থানার ভিতর দিয়ে বিদ্যাধরী নদী মাতলা নদীতে পড়েছে ক্যানিং এর কাছে। এই বিদ্যাধরীর কয়েকটি শাখা ঘুর পথে ভাঙড়ের ভিতরের অন্যান্য কয়েকটি গ্রামের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত। এর একটি শাখার সঙ্গে ভাঙড়ের তাড়দহের কাছে আদিগঙ্গা থেকে টালির নালার কাটা খালটিকে (১৭৭৫-১৭৭৭ খৃঃ) মিলিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে নদী পথে মাতলা-পিয়ালী-বিদ্যাধরী হয়ে যাতায়াত ও বাণিজ্যিক লেনদেন সহজ হয়। একই সঙ্গে সুন্দরবনের কাঠ, মোম, মধু মাছ, মাংস, ডিম এবং অন্যান্য বনজ ও কৃষিজাত ইত্যাদি সম্পদকে বাজারজাত করতে কলকাতায় আনা যায়। তাড়দহের দক্ষিণ দিকে ঐ বিদ্যাধরী নদী থেকে ক্যানিং থানার নারায়ণপুর মৌজার (জে.এল. ১৮৫) উত্তর পশ্চিম দিকে হঠাৎ একটি অশ্বখুরাকৃতি বাঁক নিয়ে বেরিয়ে আসে নদী পিয়ালী। ধারণা করা যায় (ক্ষেত্রসমীক্ষার নিরীখে) যে তাড়দহের উত্তরের যে বিশাল জলাভূমি অর্থাৎ সোনারপুর আড়াপাঁচ কালিকাপুর হয়ে সল্টলেক অঞ্চলের পুরো জলাভূমিটাই এককালে এই

পিয়ালী বিদ্যাধরীর অববাহিকা অঞ্চল ছিল। উত্তরের মূল গঙ্গা বা তার কোন শাখা হিসাবে পিয়ালী নদী এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হত এবং মধ্যভাগে বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিশে পথে আবার নারায়ণপুরের কাছে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে সোনারপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, জয়নগর হয়ে কুলতলী থানার মেরীগঞ্জ, ডোঙাজোড়া, অম্বিকানগর, কুলতলীর (জে.এল. ১৫২) উত্তর দিয়ে পূর্বমুখী হয়ে মাতলানদীতে পড়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। কুলতলীর পশ্চিম দিকে আরও কিছুটা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে আরও দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঠাকুরাণ নদীতে মিশে সাগরে পড়েছে।

নদী পিয়ালী কয়েকটি শাখা-প্রশাখা দ্বারা আদিগঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিশেছে। মদারাটের আটঘরার মধ্য দিয়ে ফর্দির খাল এবং বেগমপুর সুভাষগ্রাম আড়াপাঁচ অঞ্চলের কাটাখাল ও অন্যান্য জলপ্রবাহ তথা ড্রেনেজগুলি এক কালে ছোট বড় স্রোতা হিসাবে এই সব নদীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আবার কালাবডুর ঠিক বিপরীতদিক (দক্ষিণ-পশ্চিম) থেকে পিয়ালীর একটি শাখা রামনগর-বৃন্দাখালির সীমানা দিয়ে সঈদপুর-নবগ্রামের পাশ বরাবর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এসে একটু উত্তর-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে নাচনগাছা-সূর্যপুরের কাছে আদিগঙ্গাতে মিশেছে। এখান থেকে একটি শাখা মূলটি ধামুয়া হয়ে শালকিয়া-মাধবপুর কুলদিয়া হয়ে হুগলী পর্যন্ত গেছে। আর একটি শাখা গঙ্গার বাদা হয়ে ডানদিকে বেঁকে জগাতিঘাটা হয়ে পশ্চিমে জুলপিয়া (মগরাহাট খাল) হয়ে হুগলী নদীতে মিশেছে। আর জুলপিয়া শাখা কুঁদঘাটের কাছে আদিগঙ্গায় মিশে গেছে।

পিয়ালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা জয়নগর থানার ধোষা গ্রামের উত্তর-পূর্ব-গাববেড়িয়ার কাছ থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে বেরিয়ে একটু বাঁক নিয়ে আবার দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি মূল শাখা পিয়ালী নদীর প্রায় সমান্তরালে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে করাবেগ গ্রামকে পূর্বে রেখে নালুয়া গাঙে মিশে মণি নদীতে পড়েছে। অন্য শাখাটি পূর্ব গাববেড়িয়া থেকে সোজা পশ্চিম মুখী হয়ে গোচরণের কাছে আদিগঙ্গায় মিশেছে। যার ফলে সরবেড়িয়া মগরাহাট প্রভৃতি শাখাগুলির সঙ্গে সংযোগ সম্ভব ছিল। অন্য দিকে বারাশত জয়নগর বিষ্ণুপুরের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল।

নদী পিয়ালী মূলত ভাঙড়-সোনারপুর, ক্যানিং-সোনারপুর-বারুইপুর,বারুইপুর-ক্যানিং এবং ক্যানিং -জয়নগর থানার সীমানা (কিছু অংশ বাদে) নির্দেশ করে কুলতলী থানার উত্তরাংশ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে (ঠাকুরাণে পড়া শাখাদুটির কথা বাদ দিলে)। পিয়ালী অববাহিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রামের নাম হল ঃ বারুইপুর থানার সোলগোহালিয়া, বেগমপুর, উত্তভাগ রামনগর, বৃন্দাখালী, কালাবডু , বোলবামনি, জেলের হাট, দক্ষিণ ঘোলা, ধানখোলা ইত্যাদি। ভাঙড় থানার সাতবেড়িয়া, সুঁদিয়া। ক্যানিং থানার নারায়ণপুর, গৌড়দহ, বাঁশড়া, মরাপাই, ডেভিস আবাদ, ধর্মতলা, বড়ুকালু ইত্যাদি। জয়নগর থানার পূর্বগাববেড়িয়া, ধোষা, চন্দনেশ্বর,

তিলপী, চরাঘাটা ইত্যাদি। কুলতলী থানার মেরীগঞ্জ (মেরাগঞ্জ), পশ্চিম শ্যামনগর, গঙ্গাধরপুর, আন্ধারিয়া, বলহারালিয়া, অম্বিকানগর, ডোঙ্গাজোড়া, কুলতলী ইত্যাদি।

প্রত্ন-উৎখননের প্রেক্ষাপট ঃ

তিলপী-ধোষার প্রত্ন-উৎখননের একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার প্রকৃত ইতিহাস রচনার কাজ কালিদাস দত্ত মহাশয়ের পর খুবই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। অন্য জেলাগুলির প্রত্ন-ইতিহাস চর্চা এবং বিদগ্ধ লেখকের অভাব নেই। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্ষেত্রে সমস্যাটা ছিল বহু বিধ। ক্ষেত্রসমীক্ষা, নতুন নতুন তথ্যাদির সংগ্রহ, প্রত্ন-নিদর্শন, উদ্ধার, নতুন প্রত্নক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং তথ্যাদি ও প্রত্ন-নিদর্শনাদির বিচার-বিশ্লেষণ খুবই জরুরি ছিল। এই সব সমস্যাকে সামনে রেখেই অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎই তিলপীগ্রামের প্রত্নস্থল ও প্রত্ন-সম্পদের কথা নজরে আসে।

ইতিপূর্বে আমার 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে (মার্চ ১৯৯৭)। সেখানে ধোষা-চন্দনেশ্বর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় উচু ঢিবি, অলংকৃত সুউচ্ছ ভগ্ন অট্টালিকার অবস্থিতি সহ নানাবিধ প্রাচীন প্রত্নবস্তু বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই সময় খাড়ি-ছত্রভোগ সংগ্রহশালার শ্রীদীনবন্ধু নস্করের কাছে প্রথম তিলপীর কয়েকটি প্রত্ন দ্রব্য দেখি এবং পরে শ্রীনস্কর ও দেবী শঙ্কর মিদ্যার সঙ্গে তিলপীর প্রত্নস্থল দেখে অবাক হয়ে যাই। প্রধানত আকর্ষণ করে প্রাচীন জনবসতির প্রচুর ব্যবহার্য ও বাণিজ্যিক প্রত্নবস্তু, শিল্প দ্রব্য, বিড্স্, গ্রে পটারীর ছড়াছড়ি, ব্ল্যাক এণ্ড রেড ওয়্যার, রেড ওয়্যার, এমনকি প্রচুর ব্ল্যাক স্লিপড্ ওয়্যার এবং যথেষ্ট পরিমাণ NBP কাষ্ট কয়েন, পাঞ্চ কয়েন, বিশেষ করে তামার ও রূপার পাঞ্চ কয়েন আমাদের বিস্ময় বিষ্ট করে ফেলে। দেখা গেল বহুপ্রাচীন পটারীর ওপর পশুমুণ্ড, পাকানো শিঙের মেষ মূর্তি, পেট মোটা বিশেষ আকৃতির মূর্তি, রথের উপর সূর্য বা ইন্দ্রমূর্তি, পঞ্চচূড় ও দশচূড়বিশিষ্ট যক্ষিণীমূর্তি ও ঐরূপ সর্বালংকৃত স্বচ্ছবসনা মাতৃকামূর্তি ও দেবীমূর্তি। প্রস্তর নির্মিত দেবতা মূর্তি এবং পাঁশুটে বেলে পাথরে তৈরী বেশ কয়েকটি গড়েয়া। গৃহভিত্তি, ছাদ, মেঝে, রাস্তা, পাতকুয়ো বড় বড় পুকুর ইত্যাদি। ঘরবাড়ী, রাস্তা, মাটি, মাঠ, পুকুর, সর্বত্রই প্রচুর প্রাচীন কালের পাতলা ইট ও খোলাম কুচিতে ভরা। বেশ কয়েকবার তিলপী-ধোষাতে গিয়ে এরকম নানা প্রত্নবস্তুর সন্ধান পেলাম।

'দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল' নামক আমার ৪র্থ গ্রন্থটির তখন ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; লেখা হয়েছে পাথরপ্রতিমা থানার G-plot এর গোবর্দ্ধনপুর ও উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ নিয়ে। এ সময় তিলপী ধোষা তথা পিয়ালী তীরবর্তী প্রত্ন সম্পদ সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ধারণা করা গেছে। তাই তিলপী ধোষা নিয়ে একটা

সাধারণ ধারণা ও ছবি এই বইটাতে দিতে চাইলাম এই ভেবে যে, গোবর্ধনপুরের মত অথবা তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রত্নস্থলের কথা প্রত্নজগতের বিশেষ মানুষদের কাছে এখনই পৌঁছে দেওয়া দরকার। প্রত্নসম্পদগুলির নমুনা ও ছবি ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন প্রধান ডঃ গৌতম সেনগুপ্তকে দেখালাম। সাগ্রহে দেখে তাঁরা এগুলি গ্রন্থভুক্তি করতে বললেন। ছাপার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু বইটি প্রকাশ করতে একটু দ্বিধায় ছিলাম এই কারণে যে, এ ব্যাপারে যাদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কোন লেখা তথা অভিজ্ঞতা এই বইতে সংযোজন করা যায় কিনা। এঁদের কাছে সেই প্রস্তাব দিলে সবাই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে দেন, যা আমি আমার উক্ত গ্রন্থে সংযোজন আকারে প্রকাশ করি। ইতিমধ্যে বিড়াল গ্রামের (বারুইপুর থানা) থেকে নতুন কিছু তথ্য আসায় এবং এই প্রত্নস্থল সম্বন্ধে প্রত্নবিদদের জ্ঞাত করানোর ঐ একই উদ্দেশ্যে নিয়ে বিড়াল প্রত্নক্ষেত্রটিকেও এই গ্রন্থে সংযোজন করি। এই সব করতে বেশ দেরী হয়ে যায় এবং পূজার সময় অর্থাৎ অক্টোবর ২০০১-এর মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলাম। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম ২০০২-র কলকাতা বইমেলায় বইটি প্রকাশ করব বলে। এই সময়ে তিলপী নিয়ে দীনবন্ধুবাবুর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় স্থানীয় সাংবাদিকের সহায়তায় দৈনিক 'প্রতিদিন' পত্রিকায় ২৯.১১.২০০১ তারিখে। আর আমার তিলপী সহ অন্যান্য নতুন প্রত্নস্থল নিয়ে লেখা 'দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল' বইটি কলকাতা বইমেলা ২০০২, ৩১ শে জানুয়ারীতে প্রথম প্রকাশিত হল। তিলপী নিয়ে গ্রন্থ হিসাবে এটিই প্রথম গ্রন্থ। ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত গ্রন্থটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন নতুন প্রত্নস্থলগুলির অন্তত একটিতে, তিলপীতে উৎখননের চেষ্টা তিনি করবেন। তিলপী উৎখননের অঙ্কুরোদগমের তথা সূত্রপাত হল সেদিনই। আমরাও ব্যক্তিগত ও সমিতিগত ভাবে লেগে রইলাম। দুঃখের কথা জেলার বিশেষজ্ঞরা এখানে প্রত্ন উৎখননের ব্যাপারটা হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপদেশ দিয়েছেন প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ করে মিউজিয়ামগুলি সমৃদ্ধ করার দিকে মন দিতে। কেননা আমাদের লেখার দরকার নেই, লিখবেন বিশেষজ্ঞরা'।

আমরা এই orthodox theroy তে বিশ্বাসী নই। অন্য দিকে ডঃ সেনগুপ্ত ও ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় উৎসাহ পাই। সংগ্রহ এবং লেখা দুই-ই করতে হবে তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গীতে এবং যথা সম্ভব ভাবাবেগকে বাদ দিয়ে তিলপীর নাম তখনো পর্যন্ত অনেকেই শোনেন নি, বা তাদের সংগ্রহও তখন পর্যন্ত কিছু ছিল না, এমনকি কোন দিনই হয়ত থাকত না, যদি না আমাদের একান্ত চেষ্টায় সরকারীভাবে তিলপী উৎখনিত হত। এখন নাকি তাঁদের সংগ্রহশালায় বিশ বছর আগে থেকেই তিলপীর সংগ্রহ ছিল। জানিনা এ সব এঁরা কি করে বলেন। কেন না এসব সংগ্রহশালায় ছবি অনেকবার আমি তুলেছি কিন্তু কখনো তিলপীর কিছু পাইনি।

গোবর্দ্ধনপুর, বিড়ালের কথাও হয়ত একদিন এরা একইভাবে বলবেন। এঁরা তিলপী উৎখনন চাননি কারণ তিলপীর সমৃদ্ধপ্রত্ন নিদর্শন সম্বন্ধে কিছু জানতেন না।

অন্যদিকে ধোষা-চন্দনেশ্বর নিয়ে আমার পূর্বেকার গ্রন্থে (১৯৯৭ খৃঃ) বা নির্মলেন্দু মুখার্জীর (১৯৯৫ খৃঃ) গ্রন্থে কিছু কিছু আলোচনা থাকলেও প্রথম প্রত্নবস্তুর সন্ধান পান শ্রীঅমর কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় (রামনগর, বারুইপুর) ১৯৭৪-৭৫ সালে)। কিন্তু তিলপীর খবর দু-একজন ছাড়া তখনো কেউ পায় নি, এমনকি তিলপীর কোন প্রত্নবস্তু ২০০২ খৃঃ পর্যন্ত অন্য কোন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে বলে আমার নজরে আসেনি বা তাদের কোন রেকর্ডও ঐ সব সংগ্রহশালায় দেখিনি। তিলপী উখননের পর অনেকেই কিছু কিছু প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেছে, তিলপী-চন্দনেশ্বর থেকে। কেউ কেউ তা আগেই সংগৃহীত হয়েছে বলে জানাচ্ছে। ঠিক তিলপী থেকে না হলেও তিলপীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে মজিলপুরের কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা দু'একটি নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়।

সময় আসন্ন

যাইহোক, ২০০২ খৃঃ থেকে ২০০৫ খৃঃ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ পৃত্নতত্ত্ব বিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর নিজে কয়েকবার এসেছেন, অফিসারদের বারবার পাঠিয়েছেন এবং অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে আমার গ্রন্থে যে রকম প্রত্ন সম্ভারের কথা বলা হয়েছে তার হদিস মিলেছে আর সেগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় সব বারই আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন। আমার বই-এর ছবি ও তথাদি নিয়ে উৎখননের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই সময় ডঃ সেনগুপ্ত আর একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকাও পালন করেন। সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ এণ্ড ট্রেনিং তখন ৪নং ক্যামাক স্ট্রীটে আয়োজিত এক বিশেষ সভায় তিলপীর প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নস্থল নিয়ে একটি তথ্যপূর্ণ বিস্ময়কর আলোচনা করেন তিনি নিজেই। আলোকচিত্রের স্লাইড ও প্রচুর তথ্যাদি সহ উৎখবন-পূর্ব তিলপীর প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নস্থল নিয়ে সরকারীভাবে এই আলোচনা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। বিস্ময়াবিষ্টভাবে সারাভারতের ঐতিহাসিক ও পুরতত্ত্বাবিদ অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, গবেষক ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীগণ চন্দ্রকেতুগড় ও অন্যান্য প্রত্নস্থলের সঙ্গে তিলপীর এইসব প্রত্নবস্তু যে একই প্রকার শিল্প কলার এবং সমকালীন এই আলোচনায় তারা তার সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন সিনিয়ার অধ্যাপক ও একজন প্রাক্তন অধ্যাপিকা এসব তথ্যের সূত্র জানতে চাইলে ডঃ সেনগুপ্ত জানান যে কৃষ্ণকালী মণ্ডলের গ্রন্থে (দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল) এগুলি পাওয়া যাবে। Context- কী এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সেনগুপ্ত বলেন যে, শীঘ্রই তিলপীর উৎখনন হ'লে এর Context বোঝা যাবে। এই Context প্রত্নজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

তিলপী-ধোষা উৎখনিত হয়ে দক্ষিণ চব্বিশপরগনার লুপ্ত সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পঃবঃ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই গৌরবের অধিকারী এবং আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও স্বপ্ন এতদিন পরে সফল হওয়ায় আমরা সত্যিই আপ্লুত, আবেগ তাড়িত ও আনন্দিত।

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উৎখননের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা অনুমতিপত্র এবং অর্থের ব্যবস্থা করে এই কাজে হাত দিয়েছিল। ৩০শে মার্চ ২০০৫ খৃঃ রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় সগর্বে জানালেন যে রাজ্য সরকার ২০০৫-২০০৬ খৃঃ তিলপী উৎখনন করবে। আমরা সেই প্রথম সরকারীভাবে তিলপী উৎখনের ঘোষণা হতে দেখলাম।

তিলপীর সঙ্গে ধোষা উৎখননের পরিকল্পনা প্রধানত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপার প্রয়াত অমল রায়ের। ডঃ সেনগুপ্তকে দিয়ে একই সঙ্গে তিনি ধোষা উৎখননের পরিকল্পনাটিকে অর্ন্তভুক্ত করান। ফলে ধোষা এবং তিলপী একই সঙ্গে উৎখননের ছাড়পত্র পায়। এই কৃতিত্ব অবশ্যই শ্রীরায়ের প্রাপ্য।

এই সময়কালের প্রায় এক-দেড় বছর আগে ধোষা তিলপীর দক্ষিণ-পশ্চিমের গ্রাম করাবেগ থেকে কিছু প্রাচীন স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। ধোষার উত্তর পশ্চিম থেকে বেরুনো হবগা খালের পুর্বদিকে অবস্থিত (জে. এল. ৮৬, থানা জয়নগর) হল এই করাবেগ তথা রাজ-করাবেগ মৌজা। পুলিশ কয়েকটি হাঁড়িকুড়ি ভাঙা ও কিছু তাম্রমুদ্রা উদ্ধার করে মহকুমা শাসকের মাধ্যমে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাতে তুলে দেয়্ অনেকে সংগ্রহশালার জন্য কয়েকটি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। বেশ কিছু কেউ কেউ কিনেও নেয়।

কাশীনগর সংগ্রহশালা থেকে দুটি তাম্রমুদ্রার ছবি আমাদের কাছে এসেছে। মুদ্রা লিপিপাঠ থেকে জানা যায় যে এগুলি শক-ক্ষত্রপ রাজত্বের সময়কার রাজা অয়েস এবং এজিলিসের (খৃঃ পৃঃ প্রথম শতকের)। মৃৎ পাত্রগুলির বেশির ভাগই কূষাণ ও কুষাণ পূর্ব যুগের। রাজ্য প্রত্নবিভাগের হাতে যে মুদ্রাগুলি আসে সেগুলিও কুষাণ ও কুষাণপূর্ব যুগের। ধোষা তিলপীর প্রত্ন উৎখননের সময় এই করাবেগ গ্রামের মুদ্রাপ্রাপ্তির স্থানটিতে বারবার অনুসন্ধানে গেলেন অমল রায়, CAST- র অন্যান্যরা এবং বিশেষজ্ঞ কয়েকজন। সবই অবশ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারেই। আমিও অমল রায়ের সঙ্গে ঐ স্থান সহ সমগ্র অঞ্চলটি পরিদর্শনে গেছি (০৬.০৩.২০০৬) ধোষা তিলপী উৎখননের সময়ে।

পরিশেষে ধোষা তিলপী উৎখননের আগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুরোধ মত উৎখনন Camp office র জন্য ধোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েত অফিস, স্থানীয় ব্যাঙ্ক, সমবায় ও প্রাইভেট বাড়ীর সন্ধানে যাই প্রায় দু'মাস আগে। স্থান পছন্দ হয় না। এদিকে ফাইনান্সে দেরী হয়। শেষ পর্যন্ত ধোষার Irrigation বাংলোর খবর পাওয়া

যায় এবং তা অমল রায়কে জানিয়ে দিলে তিনি সরকারী ভাবে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে ০৮.০২.২০০৬ তারিখে লোকজন সহ চলে আসেন। কাজ প্রথম আরম্ভ হয় ধোষায়। ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ আমাদের কাছে একটি আনন্দের দিন এবং একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিন। সমবেত সকলের উচ্ছাস ও আনন্দধ্বনির মধ্যে আমাকে দিয়েই ধোষার প্রত্ন উৎখননের কাজ আরম্ভ করালেন অমল রায়, সুপারিনডেন্ট অফ আর্কিওলজি এবং ডিরেক্টর অফ্ এক্সক্যাভেশন, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। বেলা প্রায় ১১-৩০ সময় দু-নম্বর খাদের ঈশাণ কোণে আমার হাতের উত্তোলিত গাঁইতি সজোরে এসে মাটিভেদ করল। আরম্ভ হল ধোষার প্রত্ন উৎখননের শুভ সূচনা। ১১.০২.২০০৬ হেমের মজুমদারকে দিয়ে তিলপীর উৎখনন কাজের শুভ সূচনা হল।

০৮.০২.২০০৬ থেকে ১২.০৪.২০০৬ পর্যন্ত প্রায় এক নাগাড়ে কাজ চলল প্রথম পর্যায়ের। আমি প্রায় প্রতিদিন এই সময়ে উপস্থিত থাকতাম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ইচ্ছানুসারেই। পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ২০০7, ফেব্রুয়ারীতে আবার উৎখনন শুরু হয় – এবার প্রধানত তিলপীকেই বেশি জোর দেওয়া হয়। প্রত্যাশিত মত উৎখননের ফলে অনেক যুগান্তকারী তথ্য হাতে আসে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হল, খৃষ্টপূর্ব যুগের পাঁচটি শিল্পচুল্লী এবং ধাতব শিল্প কারখানা আবিষ্কার। সুন্দরবনে এরূপ প্রাচীন শিল্প কারখানার হদিস ইতিপূর্বে সকলের অজ্ঞাতই ছিল। এই ধাতু বিশ্লেষণ ও তথ্যাদি প্রকাশে ডঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সমগ্র উৎখনন ও আবিষ্কারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তথা এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত মহাশয় এবং উৎখনন প্রধান অমল রায় মহাশয়।

এর পরবর্তী বছরের তিলপী, ধোষা উৎখননের সময়ও আমরা যথারীতি সর্বদাই উপস্থিত ছিলাম আগের মতই।

উৎখননের ফলাফল ঃ

এই উৎখননের ফলাফল কি এবং কেন এই উৎখনন গুরুত্বপূর্ণ। এককথায় এই প্রশ্নের উত্তর হল, এই উৎখননের ফলাফল সুদূর প্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ। এর থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। বেসরকারী বা সরকারীভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে অনুসন্ধান, ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় প্রত্নবস্তু গুলিকে চিহ্নিত করে তাদের কালানুক্রমে বলা গেলেও তা বিজ্ঞান সম্মত নয় বলে, এতকাল শিক্ষাবিদ্ তথা প্রত্নবিজ্ঞানীদের রক্ত চক্ষুর কাছে অপাংক্তেয় ও অচ্ছুত হয়েই ছিল। প্রত্নবস্তুগুলি কোন উৎখনিত প্রত্নস্থল থেকে সংগৃহীত নয় এবং তাদের স্তর বিন্যাসও অজ্ঞাত। তাই যেকোন তথ্য এবং তত্ত্ব ঐ সংগৃহীত প্রত্নবস্তুগলি সম্বন্ধে দেওয়া হোক না কেন সোজাসুজি সেগুলিকে নস্যাৎ করতে একটি প্রশ্নই তাঁদের

যথেষ্ট ছিল – 'কনটেক্সট্ কি?' অবশ্য একথা ঠিক যে সঠিক স্তর থকে পাওয়া বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎখনিত কোন প্রত্নবস্তুর সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব এবং প্রাচীন নগর ও জনপদের অনেক তথ্যই যুগ অনুযায়ী পাওয়া যেতে পারে। স্তরভেদে তার বৈচিত্র থাকবে। গৃহ বা গৃহভিত্তি থাকলে তাঁর গঠন প্রণালীতে কালপর্যায়ে পার্থক্য ধরা পড়বে। তাই তিলপীর উৎখনন সেই Context।

২০০৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে তিলপী ধোষা উৎখননে এসব আমরা চোখে দেখেছি। সুতরাং সুন্দরবনের প্রত্নবস্তুগুলিকে আর এত সহজে নস্যাৎ করা যাবে না। এখন সবাই চন্দ্রকেতুগড়ের মতো তিলপীকেও উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করবে। সুন্দরবনের নবগঠিত পলিমাটির দেশে প্রাচীন সভ্যতার কথা যারা চিন্তা করতে পারতেন না তাঁদেরও চিন্তা করার সময় এসেছে। এই প্রত্নখননের ফলে ভারতের প্রত্ন মানচিত্রে সুন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নাম উজ্জ্বল ভাবে লিখিতে হলো। বিশেষজ্ঞদের যে অবজ্ঞা অনীহা ছিল এবার সেটা কাটবে। অন্ততঃ ২৫০০ বছরের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব আলোচনায় সুন্দরবনকে বাদ দেওয়া যাবে না। ইতিহাস পর্যালোচনা ও পুর্নগঠন অপরিহার্য হয়ে উঠবে বর্তমান প্রত্ন উৎখনন ও প্রত্নসাক্ষ্যের নিরিখে। চন্দ্রকেতুগড়ের মতোই তিলপীর শিল্পঘরানা একটি নতুন শিল্প ঘরানা যে অতীত বাংলার জনপদগুলিকে সমৃদ্ধ করে বিশ্বের দরবারে নিজেকে সগৌরবে হাজির করেছিল তা প্রমাণিত হচ্ছে। উত্তর ভারতের সমান শিল্প, সংস্কৃতি, কারিগরী দক্ষতা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বিষয়টি বর্তমান পর্যায়ের তিলপী ধোষা উৎখননে প্রমাণিত হলো। পেরিপ্লাস ও টলেমি কথিত গঙ্গাদেশ, গঙ্গামোহনা এবং গঙ্গামোহনায় গঙ্গারিডিদের দেশ তথা গাঙ্গেয়দের দেশ এবং তার সভ্যতা যে ঐ সময়ে বিস্তার লাভ করেছিল তা তিলপী উৎখননে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পিয়ালী নদী অববাহিকার তিলপী-ধোষা (ঢোষা) গ্রামাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রত্ন উৎখননের মাধ্যমে সুদূর অতীতকালে থেকে এই অঞ্চলের জনবসতি, শিল্প ও সভ্যতার সৃষ্টি ও ধ্বংসের হদিস ও তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

সংগ্রহণ

পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় স্থান ঃ অক্টারলোনি মনুমেন্ট - কলকাতা, ১৮১৮; **আছিপুর চীনা কলোনি** - ১৭৮০ চীনা বণিক টং অছু চিনি কল গড়েন বজবজের কাছে; **আদিনা মসজিদ** - মালদহ, ১৩৬৯, ৩৭৮ টি গম্বুজ ছিল, বর্তমানে ভগ্নপ্রায়; **আদ্যাপীঠ** - দক্ষিণেশ্বরের কাছে। ১৩৪০ এ শুরু, তৈরি শেষ হয় ১৩৭৫এ; **আম্রকুঞ্জ** - শান্তিনিকেতন ; **ইডেন গার্ডেন** - আকাশবানীর কাছে, ১৮৫৪; **ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম** - কলকাতা, শুরু ১৮১৪, প্রদর্শন শুরু-

পরবর্তী অংশ ১৮ পৃষ্ঠা

দেশ গড়তে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা

স্বপন মুখোপাধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, There is no castle in the world so formidable as the 'Castle in the air' অর্থাৎ শূন্যে যে দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণ করা হয় তাই পৃথিবীর সব থেকে দুর্ভেদ্য দুর্গ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা আমাদের সাধারণ ভাবনার উল্টো। নিবেদিতা স্বপ্নের প্রাসাদকেই সব থেকে অটুট আর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন কেন ? একজন স্থপতি যে ভুবনবিখ্যাত স্থাপত্য নির্মাণ করেন তার জন্য সবার আগে তিনি একটি নক্সা গড়ে তোলেন। এই নক্সাটি হল তাঁর স্বপ্নের দুর্গ। আগে যা স্বপ্নে জন্ম নেয়, তাই একটু একটু করে বাস্তবে রূপ পায়। একটি জাতির জীবনের এই স্বপ্ন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এটাই তার হাতের নক্সা, ভবিষ্যতের স্থাপত্য। যে জাতি স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে তার ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে ডুবে যেতে বাধ্য যে তার অতীত গৌরব ভোলে না, সে স্বপ্ন দেখতে ভোলে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভগিনী নিবেদিতা আমাদের অতীত সচেতন করে বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আছে, আছে দৃঢ়তা ও সাহস। সেই স্বপ্ন দেখতে জানে, আর তার স্বপ্নই তার ভবিষ্যৎ গড়ার নক্সা। নিবেদিতা বড় সুন্দর করে বুঝিয়েছেন, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা কতখানি কার্যকর। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম, অধ্যাত্মদর্শন, পুরাণ, মহাকাব্য, শিল্প, স্থাপত্য- এ সবই একজন ভারতীয় স্থপতির হাতের কাছে ছড়ানো ইট, কাঠ, পাথর, লোহার মতো মৌলিক উপাদান যা দিয়ে প্রকৃত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব। অতীতের এই নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে বর্তমানের দেশগড়ার স্থপতি অবিচল নিষ্ঠায় স্বপ্নের নক্সা অনুসারে অবিরাম কাজ করে যাবে। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ গড়া, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। কারা এই স্থপতি? ভারতবর্ষের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, সর্ব ধর্মের সর্ব বর্ণের প্রতিটি ভারতবাসী। এভাবেই অতীত- বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে একসূত্রে গেঁথে ছিলেন শিখাময়ী লোকমাতা নিবেদিতা। ১৮৯৫ সালের নভেম্বরে লণ্ডনে মার্গারেট নোবেল প্রথম স্বামীজির মুখে ভারতের সনাতন ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পেরে এই মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ঠ হন। ১৮৯৮ এর গোড়ায় স্বামীজির অনুমতি পেয়ে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অজানা দেশ ভারতবর্ষে আসেন। মাঝের তিন বছর স্বামীজি নানাভাবে মার্গারেটকে পরীক্ষা করে দেখেছেন এই নারীর মধ্যে সিংহিনীর তেজ আছে, অগ্নিশিখার পবিত্রতা আছে আর আছে ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা। মার্গারেট ভারতে আসার আগেই উইম্বলডনে নিজের বাসস্থানে বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন এবং বেদান্ত দর্শনের উপর আলোচনা ও চর্চার ব্যবস্থা করেন। তিনি স্বামী অভেদানন্দকেও বেদান্ত প্রচারে সহায়তা করেন। স্বামীজি বুঝেছিলেন এই নারী ভারতমায়ের কন্যা হয়ে উঠেছে তাই তাঁকে ভারতে আসার অনুমতি দিয়ে লিখলেন,

"তোমাকে অকপটভাবে লিখছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের কার্যে তোমার অশেষ সাফল্যলাভ হবে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং

সর্বোপরি তোমার ধমণীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বদা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে।”

মার্গারেটের মধ্যেও প্রথম দিকে এই কেল্টিক রক্তের গর্ব ছিল। কিন্তু সেই গর্ব ধূলিস্যাৎ হল যখন মার্গারেট মা সারদামণির সংস্পর্শে এলেন। তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করলেন, পৃথিবীর সমস্ত নারীর আদর্শ। ১৭ মার্চ, ১৮৯৮ মার্গারেট মা সারদামণির প্রথম দর্শন পান। মা এই বিদেশিনীকে যিনি খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী, তাঁকে অনায়াসে আদর করে নিজের মেয়ের মতো গ্রহণ করলেন। তিনি হয়ে উঠলেন মায়ের ‘খুকি’। এরপর ২৫ মার্চ স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। মায়ের নিকট - সান্নিধ্যে এসে নিবেদিতা বেদান্তের ধর্ম আর আটপৌরে হিন্দু রমণীর সাত্ত্বিক জীবন সাধনার মধ্যে অভিন্নতা বুঝতে পারলেন। মা সারদামণির মধ্যে তিনি ভারতীয় সনাতন ধর্মের ফলিত রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। নিজে বিদেশিনী হয়েও মাকে চিনলেন এবং জগৎকে চেনালেন। মিসেস সারা বুল এবং মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউড মা সারদামণির মধ্যে আপন হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পেলেন।

স্বামীজি যেমন ভারত ভ্রমণ করে ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন, তেমনি স্বামীজির তিরোধানের পর নিবেদিতাও উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন এবং তাঁর গুরুর বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু নিবেদিতার রক্তে ছিল আইরিশ বিপ্লবীর রক্ত তাই পরাধীন ভারতের মুক্তি সাধনায় নিবেদিতার অবদান অমলিন হয়ে থাকবে চিরদিন। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বরোদায় যখন গায়কোয়ারের ইচ্ছায় নিবেদিতাকে সংবর্ধিত করতে ঋষি অরবিন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখনই ভারতবর্ষের বুকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম ও বিপ্লবসাধনার এক মণিকাঞ্চন যোগ ঘটল। গোপন বৈঠক হল দুই বৈদান্তিকের মধ্যে - আধ্যাত্মিক আলোচনার সূত্র ধরেই গুপ্ত সমিতি গড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা পাকা হল। বয়সে পাঁচ বছরের বড়ো নিবেদিতা অরবিন্দকে নির্দেশ দিলেন দ্রুত বাংলায় এসে বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে। প্রস্তুত অরবিন্দ। এই মিলনের কথা লিখে গেছেন হেমচন্দ্র কানুনগো। এরপরেই বাংলার বুকে যে বিপ্লব সাধনা আমরা লক্ষ্য করলাম সবই অধ্যাত্মসাধনা – লাঞ্ছিতা ভারতমায়ের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গের মহোৎসব। এরপর যতদিন নিবেদিতা বেঁচে ছিলেন তিনিও গুপ্তসমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গোপনে কাজ করে গেছেন।

১৯০৫ এ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হল লক্ষ্ণৌতে। সভাপতি বাল গঙ্গাধর তিলক। এই অধিবেশনে এককভাবে সব থেকে কঠিন কাজটি নেপথ্যে যিনি করেছিলেন তিনি ভগিনী নিবেদিতা। সবটুকু করেছেন আড়ালে – স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদক হিসেবে প্রকাশ্যে কাজ করেছেন কিন্তু গোপনে কংগ্রেসের নরমপন্থী আর চরমপন্থীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন তিনি। স্বামীজির বাণীকে সামনে রেখে মুসলমান তরুণদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সেতু গড়ে দিয়েছেন। এই বিপ্লবী নিবেদিতা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতগতপ্রাণ লোকমাতা নিবেদিতা।

নিবেদিতা যখন ইউরোপ থেকে তাঁর বিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বার কলকাতায় ফিরলেন

তখন দেখা গেল তাঁর পোষাক একেবারে হালফ্যাসানের আধুনিকা ইংরেজ মহিলাদের মতো। অনেকে ভাবলেন, এতদিনে নিবেদিতার ভারতপ্রেম ঘুঁচেছে। এমনকি বিদ্যালয়ের কাজ সামলাতেন ভগিনী ক্রিস্টিন। নিবেদিতাকে দেখা যেত না। আসলে এই পোষাক ছিল নিবেদিতার ছদ্মবেশ। তখন থেকেই নিবেদিতার পেছনে পুলিশ ঘুরছে। সকালে বোস পাড়া লেনে ক্রিস্টিনকে দেখে গোয়েন্দা পুলিশ ভাবত বোধ হয় নিবেদিতা। কাছে এসে প্রশ্ন করে তারা হতাশ হত। এরপর আলিপুর বোমার মামলা, উল্লাসকর দত্তের বোমা নির্মাণের প্রচেষ্টার পেছনে যে নিবেদিতা সে কথা আমরা সবাই জানি। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের উপর নিবেদিতার প্রভাবের উল্লেখ পাই 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে।

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ

"প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকার কনসলের বাড়ীতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট ছোট একছড়া মালা, ঠিক যে সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আরেক দিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।" আরেকটি বর্ণনায় নিবেদিতার রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনায় সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি বলে চিহ্নিত করেন। এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অসামান্য দৃঢ় নেত্রীর প্রভাবে যে ভারতের মুক্তিমন্ত্রী বিপ্লবীরা নিজেদের প্রাণ বলি দিতে অনুপ্রাণিত হবেন, তাই তো স্বাভাবিক। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কাছে তিনি বলেছিলেনঃ

"In Ireland we have a saying that England yields nothing without bombs, every reform has to be wrested from government."

ভারতবাসীকেও ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে, তারা স্বেচ্ছায় তাদের স্বাধীনতা দেবে না। তাই হাতে তুলে নিতে হবে বোমা। সেই বোমা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার কাছে, এ-কাজ তাঁর গুরু স্বামীজির নির্দেশ পালন ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। স্বাধীনতা ছাড়া ভারতবাসীকে দারিদ্র্যও শোষণমুক্ত করা যাবে না। তাঁর ধর্মসাধনার সঙ্গে এই মুক্তজীবনের সাধনা অভিন্ন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য" (১৯২২) গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে নিবেদিতা বোনের মতো সমস্ত দায়িত্ব, নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দীনেশচন্দ্রের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' বই-এর ইংরেজি অনুবাদ History of Bengali language and Literature যাতে সম্পূর্ণত ত্রুটিমুক্তভাবে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছেন। এমনও হয়েছে সারাদিন নিবেদিতা রান্না করতে পারেননি তবু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিখুঁত অনুবাদের জন্য পরিশ্রম করেছেন। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন এই বিশাল গ্রন্থটির মধ্যে প্রাচীন বাংলার নানা লোকগাথা, সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখা হয়েছে। অনেক কাহিনী হয়তো নিবেদিতার অজানা। তিনি খুব মন দিয়ে আগে সবটা বুঝতেন, জানতেন, সূত্রের সত্যতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন তারপর অনুবাদের কাজে

হাত দিতেন। এইভাবে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর জানা হয়ে যায়। নতুন কোন তথ্যের মধ্যে বাংলা বা ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হলে নিবেদিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন। সেসব কথা ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বজনের চোখের সামনে তুলে ধরার গভীর দায়িত্ব যেন সবটাই তাঁর। কাজ শেষ হলে দীনেশচন্দ্র সবার আগে ছুটে যান নিবেদিতার কাছে। তাঁর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র ভূমিকায় নিবেদিতার নাম উল্লেখ করতে পারলেন না। নিবেদিতা যা করেছেন তার সবটাই তাঁর ভারতমাতার সেবার অঙ্গ। তারজন্য কেউ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে যে তাঁর নিবেদনের কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিবেদিতার প্রতিটি কর্মের মধ্যেই তাঁর আরাধ্যা দেবী ভারতমাতার সেবার মত ব্রত পালনের প্রয়াস ছিল। ভারতবর্ষ ছিল নিবেদিতার দ্বিতীয় জন্মভূমি আর ভারতমাতাই তাঁর আরাধ্যা জননী। প্রতিটি বাঙালি তাঁর ভাই। তাই বাংলাকে বা বাঙালিকে নিন্দে করলে তা নিবেদিতার বুকে শেলের মতো বিঁধে যেত। লর্ড কার্জন ১৯০৫ এ চ্যান্সেলার হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয়দের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের অতিকথন দোষের জন্য নিন্দে করেন। কার্জনের বাঙালি বিদ্বেষ সবারই জানা, তার উপর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় চ্যান্সেলার হিসেবে তাঁর বক্তব্যে নিবেদিতা জ্বলে ওঠেন। তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়ে দেন লর্ড কার্জন নিজে কত বড়ো মিথ্যেবাদী। The problem of the far east বই-এর থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তুলে তিনি লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠেন। পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকায় বেনামে বিষয়টি তিনি প্রকাশ করেন। নির্ভীক প্রতিবাদী নিবেদিতার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে মুখর হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভারতের অপমান যেন তাঁর ইষ্টদেবতার প্রতি অপমান। তাঁর গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র ছিল – ভারতবর্ষ - ভারতবর্ষ-ভারতবর্ষ।

কেবল ধর্মীয় আবেগ নয়, ঐতিহাসিক যুক্তি এবং শিল্পবেত্তার গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন শিল্পকলায়, স্থাপত্যে প্রাচীন ভারত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। কাকুজো ওকাকুরা একজন জগৎবিখ্যাত প্রাচ্য-শিল্প ও স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ। তাঁর ভুবনবিখ্যাত বই The Ideals of the East with special Reference to the Art of Japan-এর ভূমিকা লেখেন নিবেদিতা এবং ১৭ নম্বর বোস পাড়া লেন, বাগবাজার থেকে লেখা সেই ভূমিকায় তিনি নিজের পরিচয় দিলেন ঃ

Nivedita

Of Ramakrishna- Vivekananda

এই ভূমিকায় তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাটি লিখলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন পরাধীন ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ জীবন সত্ত্বেও কেমনভাবে প্রতি নিয়ত লাঞ্ছিতা হচ্ছে। শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

“Art can only be developed by nations that are in a state of freedom. It is at once indeed the great means and fruitage of that

gladness of liberty which we call the sense of nationality. It is not, therefore very surprising that India, divorced from spontaneity by a thousand years of oppression, should have lost her place in the world of the joy and the beauty of labour.

But it is very reassuring to be told by a competent authority that here also once, as in religion during the era of Asoka, she evidently led the whole East, impressing her thought and taste upon the innumerable chinese pilgrims who visited here universities and cave temples, and by their means influencing the development of culture, painting, and architecture in China itselft, and through China to Japan."

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এটা প্রকাশ করা যে নিবেদিতার পূর্বে ভারতের অনন্য চারুকলা, শিল্প, স্থাপত্যর উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য আর কেউ এমন যুক্তির সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে এবং শৈল্পিক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। আমরা জানি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এবং রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার এই অবদানের কথা বার বার মুক্ত কন্ঠে স্বীকার করেছেন । এর পেছনেও আছে নিবেদিতার গভীর ভারতপ্রেম ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকরা প্রথম থেকেই ভারতবাসী এবং তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণকে বর্বরতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 'হিষ্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'র লেখক জেমস মিল আজ থেকে ঠিক দু'শ বছর আগে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর যে বইটি প্রকাশ করেন সেটি ভারত সম্পর্কে জানবার ইউরোপীয়দের কাছে একমাত্র বই ছিল। অথচ এই বইতে তিনি জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন যে ভারতীয়রা এতই নীচ, হীন, বর্বর জাতি-গোষ্ঠী যে সদাশয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাদের শাসন করে সভ্য করে তোলার চেষ্টা করছে (দ্র. তর্কপ্রিয় ভারতীয়, পৃঃ ১৪২, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন)। আর 'The Web of Indian Life' নামে অসাধারণ বইটির মাধ্যমে নিবেদিতা প্রমাণ করে দিলেন ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় হিন্দু ধর্ম, ভারতের নারী এবং সাধারণ ভারতীয়দের জীবনবোধ ও ধর্মীয় আচরণ এতটাই উচ্চ শ্রেণীর, এতটাই কল্যাণব্রতী ও সহিষ্ণু যে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে তার কোন তুলনাই হয় না। তিনি দেখালেন হিন্দুর আচার-আচরণ কেবল ন্যায়নিষ্ঠ ধর্মসাধনা নয়, সেটা তাদের চরিত্র গঠনের অঙ্গীভূত। একজন সৎ ও আদর্শবান হিন্দু সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে নিজের জীবনকে সংযুক্ত করে এক ঐক্যবন্ধনে আপন জীবনচর্যার গতিপথ নির্ধারণ করেন। ১৯০৪ এর নিবেদিতার বইটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৭ সালের একটি সংস্করণে বইটির একটি ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। তখন নিবেদিতা আর ইহজগতে নেই। কিন্তু এই ছোট অথচ অসাধারণ ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন নিবেদিতা ভারতবর্ষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে সত্য আবিষ্কারে সফল হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে যে সমস্ত ইউরোপীয়রা ভারতীয় জীবনচর্যার মধ্যে কেবল

কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুরাচার ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাননি তাঁরা এক কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা নিয়ে ভারতীয় জীবনের বহিরঙ্গের সন্ধান করতে পেরেছেন। কিন্তু নিবেদিতার ছিল ভারতীয়দের সম্পর্কে গভীর ভালবাসা তাই অন্তর্নিহিত সত্য তার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যারা গান ভালবাসে না তাদের গান, শব্দের ওঠা-নামা মাত্রা যা কখনো কখনো তাদের গোলমাল বলেই ভুল হতে পারে। অথচ যাঁরা গান ভালবাসেন তাঁরা শব্দ শোনেন না, শোনের সৃষ্টির এক মূর্চ্ছনা - সঙ্গীত তাঁদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত করে। নিবেদিতাও একজন মনে-প্রাণে ভারতপ্রেমিকা ছিলেন, তাই ভারতীয়রা কোন্ চোখে নারীকে দেখে, মাকে দেখে এবং নারীই বা আপন সুখ-দুঃখকে জীবনের আদর্শ- কর্তব্য-ধর্মের থেকে কখনো কেন বিযুক্ত করে ভাবে না, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নিবেদিতা উপলব্ধি করতে পারেন যে ভারতীয়দের কাছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নিজেদের লৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। ভারতবর্ষের অন্তরের স্পর্শ না পেলে এই সত্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। ভগিনী নিবেদিতা কলম ধরেছিলেন এই সত্য পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করতে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের কথা বিশ্বে প্রচার করেছিলেন, তেমনি স্বামীজির বাণী এবং স্বামীজির ভারতবর্ষকে বিশ্বের আসরে তুলে ধরেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এতদিন পর্যন্ত যে একটা হীনম্মন্যতাবোধ গভীর হতাশার সৃষ্টি করেছিল ভগিনী নিবেদিতার বইগুলি মুহূর্তে সেই হতাশার অন্ধকারে মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণের দীপ্তি ছড়িয়ে দিল। ভারতবাসী নিজেদের বর্তমান ও অতীত সম্পর্কে নতুন চেতনায় জাগরিত হল। বাংলার নারী অক্ষর জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত। এটা নিশ্চয় লজ্জার। কিন্তু তারজন্য ইংরেজ শাসকদেরও একটা দায়িত্ব থাকে। আরো একটি বিষয় নিবেদিতা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বললেন - ভারতীয় নারীর অক্ষর জ্ঞান নেই, তাঁরা পড়তে, লিখতে পারেন না ঠিকই কিন্তু তাই বলে তাঁরা অশিক্ষিত নন। শিক্ষা কেবল সাক্ষর হলেই লাভ করা যায় না। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। ভারতীয় নারীর মধ্যে যে পবিত্র চরিত্র মাধুর্য রয়েছে তাতে তাকে অশিক্ষিত বলা যাবে না। তবে নিশ্চয় নারীকেও সাক্ষর হতে হবে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে, তাই তো ভারতে এসে তাঁর গুরুর নির্দেশে তিনি কী কঠোর পরিশ্রম করে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে – "The Web of Indian life বইতে নিবেদিতা লিখলেন –" An education of the brain that uprooted humanity and took away tenderness, would be no education at all. All education worth having must first devote itself to the developing and consoldating of characters and only secondarily concern itself with intellectual accomplishment"

তেজাস্বিনী নিবেদিতার মধ্যে ভারতবাসী প্রাচীন ভারতের গার্গী মৈত্রেয়ী ও গান্ধারীর তেজস্বিতা ও সুমেধার দ্যুতি দেখতে পেল, তাই তাঁর সমসাময়িক প্রায় সমস্ত জাতীয় নেতারাই তাঁকে নেত্রীর আসনে গ্রহণ করল। নিবেদিতা কিন্তু কিছুতেই সামনে এলেন না।

আপন ব্রত পালনে তিনি নীরব ও নিরালা বেছে নিয়েছিলেন। কোন সন্দেহ নেই স্বামীজিকে গুরুপদে বরণ করে নিবেদিতা আপন জীবন পথের সঠিক সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে এ কথাও ঠিক স্বামীজিও তাঁর বহু শিষ্য ও শিষ্যার মধ্যে ঠিক রত্নটিকে আবিষ্কার করে ভারতমাতাকে নিবেদন করেছিলেন। নিবেদিতাকে স্বামীজি বলেছিলেন ঃ

The mother's heart, the hero's will,
The Sweetness of the southern breeze,
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan altars flaming free.
All these be yours, and many more
No ancient soul could dream before.
Be thou to India's future son
The Mother, Maid and Friend in one.

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে একই সঙ্গে ভারতের মা, সেবিকা এবং বান্ধবী হবার জন্য যে আহ্বান করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবন দিয়ে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। লোকমাতা নিবেদিতা মায়ের মতোই দরিদ্র, নিঃসহায়, নিরক্ষর ভারতসন্তানদের প্রকৃত শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। মা তো কেবল অন্ন জোগাড় করে তাঁর সন্তানের প্রতি পালন করেন না, সন্তান যাতে এই জগৎ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার প্রথম শিক্ষাও মায়ের হাতে। নিবেদিতা মাত্র সতেরো বছর বয়সেই শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেন। শিক্ষাদান তাঁর কাছে বৃত্তি ছিল না, ছিল ব্রত। প্রথমে তিনি নিজেই শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতিগুলি খুব ভাল করে রপ্ত করে নেবার চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতকের নব শিক্ষা পদ্ধতির জনক পেস্টালৎসি (Pestalozzi) এবং উনিশ শতকের প্রখ্যাত জার্মান শিক্ষাতত্ত্ববিদ ফ্রয়বেলের (Friedrich Froebel) শিক্ষাদান সম্পর্কিত তত্ত্ব মার্গারেট নোবেল অল্প বয়েসেই খুব ভাল করে অনুধাবন করেন। শিশু শিক্ষার প্রথম কথাই হল সহমর্মিতা ও ভালবাসা। এই দুটি গুণ রপ্ত করতে না পারলে আদর্শ শিক্ষিকা হওয়া সম্ভব নয়। এই বোধ নবীন শিক্ষিকা মার্গারেটকে এমনভাবে প্রভাবিত করল যে এরপর সারা জীবন তিনি যে 'মানুষ হবার শিক্ষা' দিতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন তাতে সর্বদাই একনিষ্ঠ থেকেছেন। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তিনি সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং শিশুর মনোজগতের গভীরে প্রবেশ করে তার আপন হয়ে উঠেছেন সবার আগে – তাতেই তাঁর শিক্ষাদান কর্মের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি তিনি সার্থকভাবে কার্যকর করে তুলতে পারতেন। কেস উইকে যে শিক্ষকতার সূত্রপাত তার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকে। একসময় চলে আসেন রেকস্‌হামের সেকেণ্ডারি স্কুলে। একটু একটু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নোবেল খুব খুশি হল। এরপর ডাক আসে উইম্বলডন থেকে শিক্ষাব্রতী মিসেস ডি. লিউ - এর কাছ থেকে। তাঁর সঙ্গে মার্গারেটের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রকৃত শিক্ষা কী এবং কীভাবে শিশু সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে আনন্দের সঙ্গে তা নিয়ে দিবারাত্র ভাবনা চিন্তা

করতেন মার্গারেট। অবশেষে উইম্বলডনেই খুললেন নিজের স্কুল। এতদিনে মনোবাসনা পূরণ হল। স্কুলের নাম দিলেন, রস্কিন স্কুল। জীবনের এই প্রথম বয়সে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগের সুযোগ মার্গারেটকে পরবর্তীকালে আদর্শ শিক্ষিকায় পরিণত করে। নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে এসে শিক্ষা নিয়ে ভারতের বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তখন তিনি শিক্ষাকে Head-Heart-Hand এর সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষার্থীকে নিজেই নিজের জীবনের পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন নিবেদিতার তাঁর সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয় তখন কিছু কিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও শিক্ষা প্রদানের এই মূল নীতি সম্পর্কে উভয়ে সহমত পোষণ করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার এই শিক্ষাভাবনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা কেবল মেধা বা মস্তিষ্কের বিষয় নয়। প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ থাকতেই হবে। শিক্ষার্থী যদি তার হৃদয় দিয়ে তার সমাজ ও জগৎকে না বুঝতে পারে তা হলে তার শিক্ষা পরিপূর্ণ হতে পারে না। সর্বোপরি শিক্ষার্থীকে নিজে হাতে কলমে শিখতে হবে। সেই শিক্ষাই পূর্ণ শিক্ষা যা নিজেকে এই জগতের সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। স্বামীজির শিক্ষাদর্শের সঙ্গে নিবেদিতার ভাবনার সম্পূর্ণ মিল স্পষ্ট। তাই ১৯০২ সালে স্বামীজি দেহ রাখলে নিবেদিতা প্রতিজ্ঞা করলেন ভারতবর্ষের কোণে কোণে স্বামীজির 'Man making education' ছড়িয়ে দেবেন।

শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ও বিশ্বাস শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কর্মের প্রাথমিক শর্ত। এ বিষয়ে নিবেদিতার জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। নিবেদিতা যখন প্রথম ভারতবর্ষে জাহাজে করে আসছেন তখন জাহাজের ডেকে একটি ছেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ছেলেটি কেবল দুরন্ত নয়, দুর্বিনীত এবং জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের কাছে এক দুঃসহ জ্বালা। ছেলেটির মা-বাবা অতিষ্ট হয়ে ছেলেকে দেশের পথে জাহাজে তুলে দিয়েছে। সে একা চলেছে ভারতে। কিন্তু এই মূর্তিমান যন্ত্রণায় জ্বালায় সবাই এত তিতি-বিরক্ত যে তাকে সবাই এড়িয়ে চলে। নিবেদিতা ছেলেটির সঙ্গে ভাব করলেন তাকে ডেকে তার সঙ্গে নানা গল্প করতে লাগলেন। সেও ধীরে ধীরে নিবেদিতার ভক্ত হয়ে উঠল। নিবেদিতা কিছু বললে তা সে অমান্য করে না। নিবেদিতা ছেলেটিকে বিদায় জানাবার আগে তাঁর সব থেকে প্রিয় জিনিসটি ছেলেটিকে উপহার দিলেন। সেটি হল তাঁর মায়ের দেওয়া একটি সোনার ঘড়ি। উপহারটি পেয়ে ছেলেটি কেমন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। যাকে সারা জীবন সবাই দূর-ছাই করেছে তাকে এমন একটি উপহার দিলেন। পরবর্তীকালে ছেলেটির মা নিবেদিতাকে চিঠি লিখে জানান যে, নিবেদিতার প্রভাবে তার ছেলের এমন পরিবর্তন ঘটেছিল যে সে সম্পূর্ণ এক নবজগৎ লাভ করে এক সুশীল, শ্রদ্ধাবান বালকে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই একটি ঘটনা প্রমাণ করে কেন নিবেদিতার শিক্ষাদানের নীতি এমন ফলপ্রসু হয়েছিল। বাগবাজারে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে নানা আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন

কেমন করে নিবেদিতার স্নেহরসে সিক্ত হয়ে তাদের শিক্ষা-জীবন এবং চরিত্র একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল। দুঃখ-দহন হাসিমুখে গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা ছিল তাঁর শিক্ষার প্রধান অঙ্গ।

লোকমাতা নিবেদিতার লোকশিক্ষা ভারতবাসী গভীর আগ্রহে গ্রহণ করেছিল ঠিক কিন্তু নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসেছিলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষার্থী হয়ে। তিনি মনে করতেন এই মহান দেশের কাছ থেকে তাঁকে শিশুর মতো শিখতে হবে। ভারতবর্ষ যে জ্ঞানের অধিকারী সেই জ্ঞান লাভ করাই তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মার্গারেট ভারতবর্ষে আসার পর ১৮৯৮ এর ১১ মার্চ স্বামীজি স্টার থিয়েটারে একটি সভার আহ্বান করেন। এই সভার উদ্দেশ্যে ছিল, মার্গারেট নোবলের সঙ্গে ভারতবাসীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। স্বামীজির সভাপতিত্বে স্টারে যে মহতী সভা হল তাতে নিবেদিতা অসাধারণ বক্তৃতা করলেন। ভারতবর্ষের জনগণের সামনে এটিই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করে জানালেন, কেন তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন এবং ভারতবর্ষকে তিনি কোন্ চোখে দেখেন। তিনি বলেন ঃ "দীর্ঘ ছয় হাজার বছর ধরে রক্ষণশীল হয়ে থাকবার আশ্চর্য নৈপুণ্য আপনাদের আছে। এই রক্ষণশীলতাতেই একটা জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্ম-সম্পদকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে শুধু সেবা করবার জ্বলন্ত আগ্রহেই আমি ভারতবর্ষে এসেছি।"

পাশ্চাত্য যে ভারতীয় রক্ষণশীলতার এত নিন্দা, সেই রক্ষণশীলতার মধ্যে ভারতবাসীর যে অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতার প্রকাশ ঘটেছে সেদিকে মার্গারেট তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নীতি ও আদর্শকে নিজের জীবন দিয়ে কটা জাতি অবিকৃত রাখতে পেরেছে ? ইংরেজরা এবং বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত যাকে গোঁড়ামি বলে নিন্দা করেছেন – মার্গারেট তাকেই দৃঢ়চেতা আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা বলে প্রশংসা করেছেন।

নিবেদিতা ভারতীয় নারীর জীবনব্রতের মধ্যে যে গভীর আধ্যাত্মভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন, তাকে কেবল প্রশংসা করা নয়, নিজের জীবন সাধনার মধ্যেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাধন্য গোপালমা, যিনি শ্রী শ্রী সারদামণির সেবা ও যত্ন পেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন খুবই নৈষ্ঠিক বিধবা মহিলা। তিনি নিবেদিতার আচার-আচরণ ও মধুর ব্যবহারে এতটা আনন্দিত চিত্ত ছিলেন যে জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি নিবেদিতার সঙ্গে থাকতেন। দেহ রাখবার দুদিন আগে যখন তাঁর শেষসেবা করেন। এই একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় নিবেদিতা ভারতের নারীপ্রগতি ও নারীশিক্ষার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়। এই কারণে তাঁর রচনা এবং বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বাংলার এবং ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণজাগরণ ও বৌদ্ধিক চেতনার উন্মেষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ণ রিভিয়্যু' এবং ঋষি অরবিন্দের 'কর্মযোগিনে' নিবেদিতার একের পর এক লেখা

প্রকাশিত হতে থাকে। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকাটির মতো জনপ্রিয় অতি প্রাচীন কাল থেকেই সমস্ত বিশ্বের শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসমুখ তা তিনি নিজের ক্ষুরধার যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। ভারতের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে অথবা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই, সর্বত্রই এক অখণ্ড ঐক্যসূত্র বিরাজ করছে এটা এমন সুন্দরভাবে নিবেদিতার পূর্বে কেউ প্রমাণ করতে পারেননি।

নিবেদিতার সমস্ত জীবন দেবমন্দিরের একটি প্রদীপ্ত দীপশিখার মতো। দীপশিখার আলোকে সমস্ত দেবালয়ের অন্ধকার ঘুচে যায় এবং সে আলোতে নানা কাজ সমাধান করা সম্ভব – কিন্তু প্রদীপটি বিগ্রহকে আলোদান করতে নিষ্কম্প শিখায় জ্বলতে থাকে। নিবেদিতা দীপশিখায় ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি সবই আলোকিত হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই প্রদীপ্ত দীপশিখা সনাতন ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের উপর থেকে তমসাচ্ছন্নতা দূর করবার জন্যই নিষ্কম্প শিখায় অবিচল ভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। তাঁর জীবনসাধনার প্রার্থনা ছিল ঃ

'হে তেজঃস্বরূপ! আমায় তেজ দাও!
তুমি শক্তিস্বরূপ, আমায় শক্তি দাও!
বজ্র-বীর্যে উদ্বোধিত কর আমায়,
জীবন-ব্রত পালন করবার শক্তি দাও ।
(মিস। ম্যাকলাউডের কাছে প্রকাশিত নিবেদিতার প্রাণের প্রার্থনা)

৮এর পৃষ্ঠার পর

১৮৭৮; **উপাসনা গৃহ** - শান্তিনিকেতন বাংলা ১২৯৭; **উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান** - কাটোয়া; **একডালা**- দিনাজপুর। সুলতান হুসেন শাহের আমলে কিছুদিনের জন্য বঙ্গদেশের রাজধানী; **কদম-ই-রসুল**- মালদহ। ১৫৩১; **কদম শরিফ** -মালদহ। ১৭৮২; **কলকাতা** - ভারতের রাজধানী ১৭৭৩-১৯১২; **কাঞ্চনজঙ্ঘা** - দার্জিলিং; **কালিম্পং** - দার্জিলিং; **কোচবিহার**- প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দিঘি, মদনমোহন মন্দির; **কঙ্কালীপীঠ** - বীরভূম। চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব; **কর্ণগড়** - সিংহরাজাদের রাজধানী ছিল; **কর্ণসুবর্ণ** - গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী ছিল; **কামারপুকুর** - হুগলি। ১৮৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম, ৪৫ ফুট উঁচু মন্দির; **কালনা** - বৈষ্ণব ও শক্তিতীর্থ; **কাশিম বাজার** - বহরমপুর। রাজবাড়ি; **কিরীটেশ্বরী**- মুর্শিদাবাদ। প্রাচীন দেবস্থান; **কাটরা মসজিদ** - মুর্শিদাবাদ; **কালীঘাট** - কলকাতা। ৯০ ফুট উঁচু মন্দির; **কৃষ্ণনগর** - অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণবঙ্গের রাজধানী; **কেঁদুলী**- জয়দেবের জন্মস্থান। পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা; **খিদিরপুর**- কলকাতা বন্দর। ভূকৈলাস রাজবাড়ি; **গঙ্গাসাগর**- কপিলমুনির মন্দির। সর্ব ভারতীয় মিলনমেলা পৌষসংক্রান্তি; **চিকা মসজিদ**- মালদহ, রাজকীয় ভবন। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর বন্দিস্থান; **চিলকিগড়**- ঝাড়গ্রাম। রাজবাড়ি। ছৌনাচ; **চুঁচুড়া** -হুগলী, আর্মেনীয়দের গীর্জা, ১৬৯৫। পর্তুগীজদের গীর্জা ব্যাণ্ডেল চার্চ, ১৫৯৯। ইমামবাড়া, ১৮৬১; **চন্দননগর** - হুগলী। ফরাসি বাণিজ্যকুঠি

পরবর্তী অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

ব্যক্তিত্বের নিরিখে রাণি রাসমণি

ড. শিশুতোষ সামন্ত

রাণী রাসমণি আজ পর্যন্ত যত বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন বা যত উপাধিতে উপাধিত হয়েছেন তার একটি তালিকা আপনাদের সামনে প্রথমেই তুলে ধরতে চাই।

লোকে বলেন লোকমাতা; কেউ বলেন পুণ্যশ্লোকা, রাজেশ্বরী; কেউ বলেন রাজরাজেশ্বরী, কেউ বলেন জানবাজারে রানী, করুণাময়ী; কেউ বলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের পথিকৃৎ জাতীয়তাবাদের জননী; কেউ বলেন যোগিনী, তপস্বিনী, কেউ বলেন যুগধাত্রী, জগন্মাতা। কেউ বলেন নারীঋষি, নারীকুল শিরোমণি; কেউ বলেন, তিনি ছিলেন বীরধর্মব্রতা, স্বাধীনচেতা'। কেউ বলেন 'তিনি মহারাজ্ঞী, অনন্যা-অদ্বিতীয়া'। কেউ বলেন, 'মানবকল্যাণে, সেবায়, দানে ও প্রজাপালনে তিনি বিশ্বমাতৃত্বের প্রতীক, শত্রুদলনে অপরাজিতা'। শ্রীরামকৃষ্ণ ডাকতেন 'রানীমা' ব'লে, আর বলতেন, 'তিনি জগদম্বার অষ্ট নায়িকার অন্যতমা'। দীন-দুঃখী, অন্ধ-আতুররাও ডাকতো 'রানীমা' ব'লে। বাল্যকালে পাড়াপড়শীরা ও মা-বাবা এবং বিবাহোত্তরকালে স্বামী রাজচন্দ্র দাসও আদর ক'রে ডাকতেন 'রানী' বলে।

স্বপ্নে-দৃষ্ট বৃন্দাবনে রাসলীলা ঘটনার নিরিখে আপন জননী রামপ্রিয়া কন্যার নাম দিলেন 'রাসমণি'। ভাবী কাল তাঁকে চিহ্নিত করলেন 'রানী রাসমণি' ব'লে। এক কথায় শুচিসুন্দর সকল বিশেষণই তাঁর পরিচয়ের যথার্থ ভূষণ। তিনি ক্ষত্রকূল রমণী রাজক্ষত্রাণী রানী রাসমণি; রামকৃষ্ণের পালিকা আধ্যাত্মিক জননী। এত বিশেষণে বিশেষিত হয়ে বর্তমান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোন নারীর নাম শোনা যায় না।

রানী রাসমণির কর্মকৃতি ঃ তিনি বলেন, - রানী রাসমণির কর্মময় জীবনে তাঁর কর্মকৃতির তালিকা নেহাত কম নয়। তার কর্মকৃতির তালিকাটি এক এক করে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

(১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে তিনি বহুবার আইনের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। (২) জেলেদের আবেদনে গঙ্গায় বিনা করদানে তাদের মাছ ধরার অধিকার আদায় করার আগে মেটিয়াবুরুজ থেকে ঘুসুড়ি পর্যন্ত গঙ্গার অংশ লিজ নিয়ে আইন-সঙ্গতভাবে লিজ অংশের দুই প্রান্তের গঙ্গাকে শিকল দিয়ে আড়াআড়িভাবে বেঁধে দিয়ে ইংরেজ বণিকদের জাহাজ-চলাচলের গতি রোধ করেন। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাধ্য হন জেলেদের বিনা করে গঙ্গায় মাছ-ধরার অনুমতি দান করতে। (৩) গভীর রাতে ঘুমে ব্যাঘাতকারী দুর্গাপূজার সবাদ্য মিছিলের গতিরোধ ক'রে গোরা সৈন্যসহ ক্ষিপ্ত ইংরেজ কর্ণেল মিছিল না থামালে গুলি করার হুমকি দিলে, রাসমণির নির্দেশে তাঁর নিজস্ব বন্দুকধারী দরওয়ান দিয়ে সৈন্যদের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে তাদের মাথা হেঁট করিয়ে সরিয়ে দিয়ে মিছিলের উদ্দেশ্যে সফল করেন। সেই সঙ্গে আরও অনেক ঢাক রাণীমার নির্দেশে শোভাযাত্রায় সংযোজিত হয়েছিল। (৪) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রাসমণি দেবীকে ৫০ টাকা জরিমানা করলে, সেই টাকা তিনি আদালতে জমা দিয়ে আদালতের মান রাখতে ভুললেন

না' কিন্তু রাণীমার নির্দেশে নিজসম্পত্তি জ্ঞানবাজারের বাড়ি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুধার গরাণ কাঠ ও কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে যান-চলাচল বন্ধ ও জনজীবন স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার আকস্মিকতার বিদেশী শাসক আদালতে নতি স্বীকার ক'রে জরিমানার ৫০ টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। (৫) ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্রোহী সিপাইদের নির্বুদ্ধিতার বিরোধিতা করেন, কিন্তু ঘটনার দায় যে শাসকসম্প্রদায়ের সে কথা জানিয়ে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রানী রাসমণি তার সমর্থন জানিয়েছিলেন আর পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালীর মতন। (৬) নির্বিচারে নিরাপরাধ ইংরেজ নরনারী ও শিশুহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং ধর্মের নামে এহেন অধর্মের কায়েমে রাসমণি দেবী ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এহেন কাজ সমর্থনযোগ্য নয় ব'লেও মত প্রকাশ করেন। (৭) প্রজাদের আবেদনে মকিমপুর পরগণায় পঞ্চাশজন পাইক ও লেঠেল পাঠিয়ে অত্যাচারী নীলকর সাহেব ডোনাল্ডকে মেরে আধমরা ক'রে নীলচাষের বিভীষিকা থেকে প্রজাদের মুক্ত করেন। এই ভাবে রানী রাসমণিই প্রথম নীলবিদ্রোহ শুরু করেন এবং পরে সেই বিদ্রোহের ধারায় আসেন পোড়াগাছার দিগম্বর বিশ্বাস ও চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। (৮) তাঁর জানবাজারের বাড়িতে বলপূর্বক প্রবেশকারী সিপাহী বিদ্রোহোত্তর উচ্ছৃঙ্খল পিটুনী-খাওয়া উন্মত্ত গোরা সৈন্যদের বিধ্বংসী তাণ্ডবের হাত থেকে রঘুবীর মূর্তিতে তরবারি ধারণ করেছিলেন এবং পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন। এরূপ আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরি উক্ত ঘটনাসমূহ যেমন রানী রাসমণির দুর্জয় সাহস, ক্ষাত্রবীর্য বা ক্ষাত্রতেজেরই পরিচায়ক, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাগুলিও তাঁর জাতি-চেতনা, জাতীয়তাবোধ ও প্রচ্ছন্ন স্বাধীনতা-স্পৃহারও ইঙ্গিত বহন করে।

রানী রাসমণির কর্মকৃতির আর একটি দিক হ'ল তাঁর সমাজসেবার কাজ। তার কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ এখানে করতে চাই। যেমন - (১) রানী রাসমণি জাতিভেদ প্রথার গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি কন্যাদায়গ্রস্থ এক ব্রাহ্মণের দুই কন্যার বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছিলেন (২) উক্ত কন্যাদ্বয়ের একজন নিঃসম্বল অবস্থায় বিধবা হ'লে তার একমাত্র পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার রানীমা গ্রহণ করেছিলেন, (৩) তিনি হয় স্বয়ং, না হয় রাজচন্দ্র দাসকে দিয়ে গঙ্গার উপরে তেরটি ঘাট নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে তিনখানি ছিল রাজচন্দ্র দাসের হাতে গড়া। (৪) প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে তিনি যেমন কলকাতার ভবানীপুরে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেমনি (৫) মেট্রোপলিটান স্কুল (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) নির্মাণে তিনি দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। (৬) জানবাজার থেকে মৌলালী পর্যন্ত পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের সম্পূর্ণ ২৫০০ টাকার ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করেছিলেন। (৭) মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখার তীর থেকে পুরীর মন্দির পর্যন্ত যে পাকা সড়কটি অহল্যাবাই রোড নামে পরিচিত, সেটি রাসমণি দেবী তাঁর সেজ জামাতা মথুরবাবুকে

দিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন। (৮) গভর্নমেন্ট লাইব্রেরী (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি বা বর্তমান ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর) উন্নতিকল্পে এককালীন ১০ হাজার টাকা দান, হিন্দু কলেজ (পরবর্তী প্রেসিডেন্সী কলেজ, বর্তমানের প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপনে অর্থ দান, কলকাতার হাসপাতাল স্থাপনে ১৫ হাজার টাকার দানরূপ বহু দাতব্য কাজ তিন রাজচন্দ্রের সহায়ে করেছিলেন বা এককভাবেও করেছিলেন। সমাজসেবার এরূপ বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়।

রানী রাসমণি রাজচন্দ্র দাসের রেখে-যাওয়া বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। তিনি নিজেও সেই জমিদারিকে অনেক বাড়িয়েছিলেন। সেই বিশাল জমিদারী পরিচালনা নিজহাতে করতেন। সেই সঙ্গে কাজ করেছিল তাঁর ব্যবসায়িক তথা বৈশ্য-বুদ্ধি। তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। যেমন - (১) চাষের সুবিধার জন্য ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মধুমতী ও নবগঙ্গা'কে সংযোগ করে 'টোনা খাল' নির্মাণ করেন যা 'টোনার খাল' খাল নামে বেশি পরিচিত। বন্যার পলিতে সেখানকার জমি উর্বর হয়ে উঠলে সেখানে যেমন প্রচুর ফসল ফলতে থাকে, সেরূপ বনজ-সম্পদ যেমন, – বাঁশ, কাঠ, আনারস, প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে ফলতে থাকে। (২) সেগুলিকে কলকাতায় এনে বিক্রয় করার জন্য কলকাতা ও বিভিন্ন স্থানে আড়ত বা বাজার স্থাপন করেন। বেলেঘাটার অবস্থিত এরূপ একটি আড়তে মাল আনার জন্য খালের প্রয়োজনে জানবাজারের দাস বা মাড় পরিবার থেকে বিনা পয়সায় ইংরেজ সরকারকে জমি দান করা হয়েছিল। সে আড়ত আজ আর নাই। তবে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বেলেঘাটার রাসমণি বাজার (ভিন্ন মালিকানায় ভিন্ন নামে) ও ভবানীপুরের জগুবাবুর (যদুবাবুর) বাজার আজও বর্তমান। আর খিদিরপুরের সোনাই-এ প্রতিষ্ঠিত বাজারখালির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই।

সেদিনের মধ্যযুগীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রানী রাসমণির অবদান অস্বীকার করা যাবে না। এগুলি কি তাঁর বৈশ্যোচিত মানসিকতার পরিচয় নয় ?

রানী রাসমণির কর্মকৃতির আর একটি দিক হ'লো সমাজসংস্কার আন্দোলন। এই সমাজসংস্কার আন্দোলনেও রানীমার অবদান কম নয়। যেমন - (১) সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনের তিনি স্বামী রাজচন্দ্র দাসকে রাজা রামমোহনের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর রানী রাসমণির অনুপ্রেরণায় রাজচন্দ্র দাস আন্দোলনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু অত্যাধিক সভাসমিতির চাপে রাজচন্দ্রকে অকালে হারাতে হয়। (২) ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনি বিদ্যাসাগরের পাশেই ছিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। (৩) তথাকথিত কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার অবসানের জন্য সরকারের কাছে দরখাস্তকারীর মধ্যে রানী রাসমণিও একজন ছিলেন।

জানবাজারের নিমতলার বাড়িতে রাসমণি দেবী যখন আসেন তখন তার বয়স ১১ বছর। দারওয়ান, কর্মচারী, ঝি-চাকর, রাঁধুনী মিলিয়ে জানবাজার প্রাসাদের লোকসংখ্যা তখন প্রায় দুই থেকে তিন হাজারের মধ্যে। বিবাহের কিছু দিন পর থেকেই রানী রাসমণি সেখানকার রসুইখানার দেখভালের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন এবং রান্না ঘরের কিছু কিছু

কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঝি-চাকরদের কাজ কমিয়ে দেন। এখানে তাঁর নিরহংকার সেবাধর্মের পরিচয়টি পরিস্ফুট।

তথাকথিত উচ্চবর্ণের কেউ কেউ রাসমণি দেবীকে শূদ্রাণী ও জেলের মেয়ে ব'লে উল্লেখ করেন বা লেখেন। সেটা তাঁদের ভারতের জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞতার কারণও হতে পারে, অথবা নৈকষ্য কুলীনের সন্তান হওয়ার সুবাদে গর্বের প্রকাশও হতে পারে। কিন্তু 'শূদ্রাণী' ছাড়া মায়ের বড় পরিচয় আর কিছু আছে কি ? একটি নার্সিং হোমে বা হাসপাতালে একটি নবজাতককে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করলে একজন সেবিকা যদি গুণকর্ম অনুসারে শূদ্রবর্ণ-ভুক্ত হন এবং সেই একই কাজ যখন একজন জননী (তা সে যে কোন জাতের হোন না কেন) আপন গৃহে নিজ হাতে করেন, তখন তিনি শূদ্রবর্ণের বাইরে যাবেন কি করে বর্ণের সংজ্ঞা অনুযায়ী ?

পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত ১২৩০ বঙ্গাব্দে বন্যাক্লিষ্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শহরবাসীর জন্য মাসের পর মাস বিনা পয়সায় আশ্রয় ও অন্নদান রানী রাসমণির নিষ্কাম সেবা-ধর্মের পরিচয় নয় কি ! আর নিষ্কাম সেবার কাজ তো শূদ্রের কাজের মধ্যেই পড়ে।

আবার অন্যদিকে, জাতিভেদ প্রথার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে যে সমদর্শিতা দেখিয়েছেন, সেটাই তাঁর ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ নয় কি ? মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছেন যে, একজন মানুষ যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন যার মধ্যে সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া থাকে তাকেই ব্রাহ্মণ বলা যাবে।'

পরন্তু ভারতের স্বাধীনতার শত্রু ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সিপাহী-বিদ্রোহের সৈনিকরা যখন অসহায় ইংরেজ শিশু ও নরনারীদের হত্যা করছিলেন, তখন রানী রাসমণি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয়-নেওয়া শিশু ও নরনারীদের জন্য হাতির পিঠে চাপিয়ে তাদের জন্য খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে তাদের রক্ষা করেছিলেন, যদিও তিনি নিজেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। এই ঘটনার মধ্যেই তাঁর বিশ্বমাতৃত্বের রূপটি ধরা পড়ে।

উপরে উল্লিখিত তাঁর কর্মকৃতিসমূহ তাঁকে সাধারণ মানবী থেকে মহামানবীতে উন্নীত করে।

রানী রাসমণির ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে রূপা-নির্মিত রথযাত্রার সূচনা, জানবাজারের বাড়িতে তৎকালে প্রচলিত সব রকমের পূজা-অনুষ্ঠান এবং দোলপূর্ণিমাসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান, কালীঘাটের বাড়িতে বাৎসরিক কালীপূজার অনুষ্ঠান, দক্ষিণেশ্বর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভবতারিণী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার বিষয়টি পরিস্ফুট। একান্ত অপরাগ না হলে তিনি প্রতি বছরেই কোথাও না কোথও তীর্থযাত্রা, তীর্থস্নান এবং দেব ও সাধুসন্তদের উদ্দেশ্যে অকৃপণ হস্তে অলঙ্কার, অর্থ, বস্ত্র বা অন্ন দান করতেন। কেউই বিমুখ হতেন না। তীর্থযাত্রীদের জন্য পান্থশালাও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন কোথা ও কোথও। লক্ষণীয় যে এ বিষয়ে তিনি ধর্মপ্রাণা রাজ্ঞী অহল্যাবাই-এর কর্মকৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নি।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরসমূহের দেওয়ালে দেওয়ালে-আঁটা পাথরসমূহের খোদাইগুলির পাঠ থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক ধর্মের নবজাগরণের লক্ষ্যে তাঁর লক্ষ্য কত স্থির ও সূচাগ্র, আশা কত উচ্চ এবং আকাঙ্খা কত প্রবল ছিল। আর কত সূচীমুখ ছিল তাঁর মানুষ-চেনার ক্ষমতা, যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি অবতার বরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে।

সমাজের উচ্চতলার লোকগুলি এখনও তাঁকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কিন্তু কেন? নির্ধন ধনীকে হিংসা করবে, অজ্ঞানী জ্ঞানীকে ঈর্ষা করবে, অন্ধ চক্ষুস্মানকে দ্বেষ করবে, পঙ্গু চলমানকে ঈর্ষা করবে – এটাই তো স্বাভাবিক। বিভিন্ন সংহিতায় মাহিষ্য জাতির সাত/আট রকমের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে; বলতে কি কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। এগুলি ঈর্ষান্বিত তথাকথিত উচ্চকুলজাত পণ্ডিতদের প্রক্ষিপ্ত - করণের ফসল। হঠাৎ করে পণ্ডিতকূল একটি জাতিকে নিয়েই বা এত মেতে উঠলেন কেন ? এর একমাত্র কারণ 'হিনম্মন্যতা'; কারণ তাঁরা জানেন যে, মাহিষ্য এমন একটি জাতি যা সমগ্র ভারতবর্ষ তো বটেই, দূর অতীতে ভারতের বাইরেও তারা তাদের রাজ্য বিস্তার করেছিল।

'মাহিষ্য' শব্দটি কোন বাংলা শব্দ নয়, এটি কোন সংস্কৃত শব্দও নয়। এটি ঋগ্বেদীয় যুগের শব্দ। এটি হসন্ত-চিহ্নসহ 'মহিষ' শব্দ থেকে এসেছে। মহিষ শব্দের 'মহান, বড়', ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'দি গ্রেট'। মাহিষ্য শব্দটির অর্থ মহান বংশজাত। স্ত্রীলিঙ্গে রাজমহিষী' শব্দের অর্থ রাজার প্রধানা স্ত্রী। স্বনামধন্য প্রবোধচন্দ্র সেন গদাধর কোলের 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন –"মহিষ শব্দ মূলতঃ মহৎ শব্দ থেকে উৎপন্ন। মহিষ শব্দের মৌলিক অর্থ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। যেমন 'মহিষী' মানে 'প্রধানা' রাজপত্নী। মহিষাসুর কথার আসল মানে শ্রেষ্ঠাসুর। এমনি কি পশু অর্থে মহিষ কথারও আসল মানে বৃহৎ বা প্রধান পশু। সুতরাং মাহিষ্য শব্দ সমাজের মুখ্য বা প্রধান সম্প্রদায় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় থেকে উৎপন্ন।"

মহিষাসুর এর অর্থ 'অতি শক্তিশালী বা প্রধান বা মহান অসুর'। তাঁর জীবনের কোন ঘটনাই পশুরূপ মহিষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। ওটি স্বজাতির আত্মগ্লানি বা সত্য কোন ইতিহাসকে গোপন করার জন্য মহিষ-মস্তিকের কোন শাস্ত্রকারের বা পরবর্তী হীনমন্য পণ্ডিতকুলের চক্রান্ত মাত্র।

'আর্যজাতি' বলে কোন জাতি কোনকালেই ছিল না, আজও নেই ও ভবিষ্যতেও থাকবে না। আর্যভাষা বলেও কিছু নেই; 'আর্য একটি সভ্যতার নাম। সেটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। 'আর্য' শব্দটি কৃষিকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখনও জমির পরচা বা দলিলকে জমির 'আর্যা' বলা হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন যখন দেবী দুর্গার স্তুতি শুরু করেন, তখন তিনি প্রথমেই দেবী দুর্গাকে 'আর্য্যে' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায় (স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, গীতাপ্রদীপ(১৪১৭ বঃ, পৃঃ-২৪)। অতীতে স্ত্রী স্বামীকে আর্যপুত্র বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। আবার শ্বশুর মহাশয়কেও আর্যপুত্র বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। আবার রামের বনবাস-যাত্রা কালে অযোধ্যার যেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ তাঁকে কিয়দ্দুর অনুসরণ করেছিলেন, শ্রীরাম তাঁদের 'আর্য' বলেই সম্বোধন করেছিলেন।

এই আর্য-শব্দের উৎসস্থল সাঁওতাল-ভিল-মুণ্ডাদের ভাষা। ওদের আর্জাও শব্দ থেকেই আর্য শব্দের উদ্ভব। সাঁওতালি - ও কোলভাষা - গোষ্ঠীর মধ্যে আর্জাও এর অর্থ চাষ করা। আর্জাও > আর্যাও > অর্জন শব্দের উদ্ভব। অর্থাৎ চাষের মধ্য দিয়েই ধন-অর্জনের কথা বলা হয়েছে। সুপ্রাচীন যুগে কৃষিকার্যই ছিল ধন-আহরণের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই উত্তর-ভারতের 'আর্যাবর্ত্ত' নামটি আর্যনামক কোন জাতির বা ভাষাভাষীর বসবাসের স্থাননাম থেকে আসে নি – এসেছে কৃষির - স্বর্গভূমিরূপে। ওটি উত্তর-ভারতের 'কৃষ্যাবর্ত্ত'। সাঁওতালী ভাষায় কিষাণ (কিষাঁড়) শব্দের অর্থ ধনী। প্রকৃতপক্ষে 'আর্য' কথার মৌলিক অর্থ 'কৃষক'।

(সুহৃদকুমার ভৌমিক, আর্য রহস্য, পৃঃ ১৮, ১৯)

ওই একই কারণে পূর্বভারতের ধান-উৎপাদনকারী অঞ্চলটি 'কলিঙ্গ' (এখানে ক্লীবলিঙ্গ 'ক'-এর অর্থ ধান, তাই ধান-চালের আড়ৎদারকে কয়াল বলা হ'ত; লিঙ্গ-শব্দটি উৎপাদন অর্থে ব্যবহৃত) নামে চিহ্নিত হয়েছিল, যার রাজা ছিলেন চন্দ্রবংশীয় সুতপাপুত্র বলি।

[(ইনি দৈত্যবংশীয় (বিরোচপুত্র) এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিশ্বর রাজা বলি ছিলেন না, যাঁকে বামন বিষ্ণু রসাতলে পাঠিযে দিয়ে ছিলেন বসবাসের জন্য। আর সেই রসাতলটি সম্ভবতঃ আমেরিকার 'বলিভিয়া'। ভিয়া-র অর্থ বাসস্থান)।

[উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন , মানবের আদি জন্মভূমি]

আগেই বলেছি 'আর্য' একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতার নাম। এই সভ্যতার বয়স সম্ভবতঃ দশ থেকে পনর হাজার বছরের মধ্যে; যদিও সনাতন ভাতরীয় সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা তথা ঋষিসভ্যতার সঠিক কালনির্ণয় বড়ই কঠিন। উক্ত আর্যসভ্যতার উদ্ভবের ভিত্তিভূমিতে ছিল দশ আর্য ঋষির অবদান। তাঁরা হলেন মরীচি, অঙ্গিরা, পুলতা, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ।

শকুন্তলার প্রিয়সাথি অনসূযার নাম? এই অনসূয়ার সঙ্গে অত্রিমুনির বিবাহ হয়, যিনি বৈদিক শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত সপ্তর্ষি মুনিরূপে চিহ্নিত। এখানে 'সপ্তর্ষি' গুণনির্দেশক একটি উপাধিমাত্র। আর্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই মাহিষ্যজাতির পুর্বতন প্রথম পিতা এবং অনসূয়া প্রথম জননী। এদের তৃতীয় সন্তান সোম বা চন্দ্র। তিনি পুরাণে ক্ষত্রিয়রূপেই চিহ্নিত। চন্দ্রের বংশধরগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত। তাই পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যে কোন স্থানের মাহিষ্যগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রূপেই চিহ্নিত হয়ে আছে। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, মাহিষ্যরাই একমাত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়। আজকার অনেক তফসিলি জাতিও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে পড়ে, যেমন পৌন্ড্রক (পোদ), শৌন্ডিক (শুঁড়ি), অন্ত্রীয় (বাগদী), শবর, কেরেলীয় (কাওড়া) নমঃশূদ্র (নিষধ; নিষাদ নয়), পুলিন্দ (পিল্লাই), মুতিব, মদ্রক, কটু ইত্যাদি। এই চন্দ্রবংশীয়রা সকলেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশধর।

উক্ত অত্রি-অনসূয়ার প্রথম সন্তান বিখ্যাত দুর্বাসা মুনি (চন্দ্রবংশীয়দের বড় জেঠু), দ্বিতীয় সন্তান অবতার পুরুষ মহামুনি দত্তাত্রেয় (চন্দ্রবংশীয়দের মেজজেঠু) এবং তৃতীয়

সন্তান সোম বা চন্দ্র (ইনিই চন্দ্রবংশী নামীয়দের শাস্ত্রসম্মত পিতৃপুরুষ)। সেদিনের সমাজব্যবস্থার নিরিখে চন্দ্রের ঔরসে তাঁর (চন্দ্রের) গুরুপত্নী (বৃহস্পতির স্ত্রী) তারা'র গর্ভে বুধেরজন্ম হয়। এরই নামে বুধবার। সোম বা চন্দ্রের নামে সোমবার, বৃহস্পতির স্মরণে বৃহস্পতিবার। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নামে শুক্রবার। বাকিদিনগুলির নাম সুর্য্যবংশীয়দের নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। সপ্তর্ষি মরীচির পৌত্র বিবস্বান্‌ (সূর্য) এর নামে সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠা। এই সূর্যের বড় নাতনী এবং ইক্ষ্বাকু ভগিনী ইলার সঙ্গেই বুধের বিবাহ হয়। প্রাচীন ভৌগলিক ইলাবর্ষ এঁর স্মৃতিই বহন করে চলেছে। এই বুধের পুত্রই পুরুরবা (দেব-নর্তকী উর্বশীর স্বামী) বিবাহপূর্ব জীবনে রাজা মিত্রের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠ দেব এবং রাজা বরুণের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে অগস্ত্যা মুনির জন্ম হয়।

বুধের অন্য এক স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন চৈত্র এবং এই চৈত্রের পুত্রই শ্রীশ্রী চণ্ডী খ্যাত রাজা সুরথ।

পুরুরবার পুত্র আয়ূ। আয়ুর পুত্র নহুষ। দেবরাজ ইন্দ্রের পলাতক জীবনকালে এই অতি নিষ্কলুষ ও চরিত্রবান নহুষকে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়ে তাকে ইন্দ্রপদে বরণ করা হয়। ধীরে ধীরে ক্ষমতার প্রভাবে শচীদেবীর প্রতি তাঁর লক্ষ্য পড়ে। শচীদেবী দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন। বৃহস্পতি শচীদেবীকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেন। ইন্দ্রের পরামর্শে নহুষকে মুনি ঋষি বাহিত শিবিকাতে চড়ে তাঁর কাছে আসার অনুরোধ করেন।

নহুষ তাই করেন। এই সময় ক্ষত্রিয়গণই বর্ণশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রাহ্মণপদবাচ্য শিবিকাবাহকদের একজন ছিলেন অগস্থ্য মুনি। পালকিতে উঠেই নহুষ পালকিবাহক মুনি-ঋষিদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। উত্তেজনা বশতঃ নহুষের পা অগস্থ্যের অঙ্গ স্পর্শ করে। তখন অগস্থ্য মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে নহুষকে অভিশাপ দিলে, তিনি অজগর সাপ হয়ে বিশাখযূপ বনে পতিত হয়। পাণ্ডবদের বনবাসকালে অজগরের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে কিভাবে যুধিষ্ঠির নহুষকে শাপমুক্ত করেছিলেন তা অজানা নয়।

এই নহুষের ছেলেই যযাতি। যযাতির দুই স্ত্রী : দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভজাত সন্তান যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত সন্তান অনু, দ্রুহ্যু ও পুরু। এরা সকলেই মহাভারত-বিখ্যাত। উক্ত যদুর পুত্র সহস্রজিৎ, তৎপুত্র শতজিৎ, তৎপুত্র হৈহয়। এই হৈহয়ের বংশে অত্রি মুনির ১৬তম বংশধর হবেন রাজা মহিষ্মান। পশ্চিম ভারতে 'নর্মদা' নদীর তীরে অবস্থিত মাহিষ্মতীপুর রাজা মহিষ্মানের রাজধানী ছিল। মহিষ্মানের প্রতিষ্ঠিত বংশ মাহিষীবংশ নামে খ্যাত। এরাই পরে মহিষক, মাহিষক, মাহিষ্য, মাহে, মাহেশ্রী, মাহেশ্রী বানিয়া ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়েছেন। আফগানিস্তানের প্রাচীন নাম ছিল মাহিষিক দেশ। দাক্ষিণাত্যেও একটি মহিষিক রাজ্য বর্তমান ছিল।

রাজা মহিষ্মানের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন রাজা কার্তবীর্য্যাজুন (কার্তবীর্য বা অর্জুন নামেও খ্যাত)। একসময় কার্তবীর্য ও তাঁর কুলপুরহিত পরশুরামের পিতা ঋষি জমদগ্নির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ফলে ঋষি জমদগ্নি নিহত হন এবং তাঁর কামধেনু 'কপিলা' অপহৃত হয় এবং এরই ফলস্বরূপ ক্রুদ্ধ পরশুরাম কার্তবীর্য ও তাঁর বংশধরদের হত্যা করেন

এবং পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ ব্রত শুরু করেন। পরশুরামের ভয়ে হৈহয়বংশীয় মাহিষী তথা মাহিষ্যগণ রামায়ণ-বর্নিত পূর্ব ভারতের 'কেবর্তভূমে' তথা অবিভক্ত কলিঙ্গদেশে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেন। পিতামহ ঋচিকের উপদেশে পরশুরাম ক্ষত্রিয়হত্যা বন্ধ করেন। কিন্তু সেই থেকে সর্তসাপেক্ষে সমাজে ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ মেনে আসা হচ্ছে; কিন্তু মাহিষ্যদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া পৃথিবীকে সূর্যের পিতা মহাত্মা কশ্যপকে দান করে তিনি (পরশুরাম) মহেন্দ্রপর্বতে বসবাস করতে চলে যান।

মাহিষ্যকুলজাত কার্তবীর্যার্জুন এমনই এক রাজা ছিলেন যে, চতুর্বর্ণ-বিশিষ্ট ভারতীয় হিন্দুসমাজের প্রাতস্মরণীয় প্রণাম মন্ত্রে তাঁকে এখনও স্মরণ ও প্রণাম করা হয়। এও বলা হয় যে, তাঁকে স্মরণ করলে হারানো জিনিষও ফেরৎ পাওয়া যাবে। সমগ্র পৃথিবীই তাঁর অধীন ছিল ব'লেও বলা হয়ে থাকে?

(গৌরাঙ্গসুন্দর ভট্টাচার্য ও শ্রীরামদেব ভট্টাচার্য, বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি, পৃঃ-৯)

রাজা কার্তবীর্যের পুত্র মধু (বা মধুধ্বজ) এবং মধুধ্বজের পুত্র বৃষ্ণি। শ্রীমদ্ভাগবত মতে এই মধু ও বৃষ্ণির স্মরণে কৃষ্ণ নিজেকে যথাক্রমে মাধব ও বার্ষ্ণের বলতেন।

উপরে উল্লিখিত সহস্রজিতের দ্বিতীয় ভাই ক্রোষ্টু। এই ক্রোষ্টুর ধারায় অত্রিমুনির অধস্তন ৪০তম বংশধর সাত্ত্বত। ইনি বৈষ্ণবধর্মের একজন প্রবক্তা। এনার বংশে অত্রিমুনির ৫৫তম অধস্তন বংশধররূপে স্বয়ং বলরাম, সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ ও আরও অনেকে জন্মগ্রহণ করেন। নন্দরাজা ও বসুদেব দুই বৈমাত্রের ভাই। এ থেকেই স্পষ্ট যে রক্তের রসায়নে মাহিষ্যজাতির রক্ত ও শ্রীকৃষ্ণের রক্ত একই ধারায় প্রবাহিত। এমনই এক রক্তধারা নিঁয়ে রানী রাসমণি মাহিষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইং-১৯২৫ সালে সুদূর ফ্রান্স থেকে কেদারনাথ মিশির নামে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 'কায়স্থ মেসেঞ্জার' পত্রিকায় প্রকাশিত "মাহিষ্য ও তাদের ব্রাহ্মণ" নামক এক ইংরাজী প্রবন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে নন্দরাজাকে মাহিষ্য বলে মত প্রকাশ করে গেছেন। সেক্ষেত্রে গোপীগণ মাহিষ্যকুলরমণী ছাড়া আর কি হতে পারে! এই নন্দরাজার স্ত্রী যশোদার কোলেই শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হন। শ্রীমদ্ভাগবত অনেক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার, উনবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা দেখছি, অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই একই ভাবে মাহিষ্যকুল রমণী রানী রাসমণির শরণে আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলেন।

আবার অন্যত্র দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের উদযাপন উপলক্ষে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সমেত তাম্রলিপ্তরাজ তাম্রধ্বজের হাতে বন্দী হয়ে রাজবাড়ির আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। বিদায় বেলায় তাম্রধ্বজের পিতা পরম ভক্ত ময়ুরধ্বজের কাছে শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছিলেন তার সহজ বঙ্গানুবাদ হ'ল –

'আমার বুক থেকে লক্ষ্মীকে যেমন নামিয়ে দেওয়া বা আলাদা করা সম্ভব নয়, তেমনি তাম্রলিপ্তের মনোহারী সৌন্দর্য্যের স্মৃতিকেও আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কল্পে আমি যখন জন্মগ্রহণ করব তখন এই তাম্রলিপ্তেই জন্মগ্রহণ করব।'

জ্ঞাতব্য যে, তাম্রলিপ্ত একটি মাহিষ্যজাতি-অধ্যুষিত এলাকা। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এহেন মাহিষ্যজাতি যদি নীচু স্তরের জাতি হবে, তাহলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় মাহিষ্যবংশের কুলতিলক কার্তবীর্জাজুনের পুত্র মধু'র সাপেক্ষে নিজেকে মাধব' এবং মধুর পুত্র বৃষ্ণি'র সাপেক্ষে নিজেকে 'বার্ষ্ণেয়' বলে পরিচয় দিয়ে গেছেন কেন।

বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় বা বর্ণের ওপর গবেষণা চালাতে গিয়ে দেখা গেছে যে মহিষ, মহিস, মহিষা ও মোহিষ শব্দযোগে উড়িষ্যাসহ অবিভক্ত বাংলায় বহু গ্রামনাম রয়েছে। উল্লেখ্য যে সুদূর অতীতে কলিঙ্গরাজ্য ছাড়াও মাহিষ্যরাজ্যের অবস্থান ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও বাংলার মাহিষ্যগণকে যুদ্ধ করতে দেখা যায়।

এ থেকেই বোঝা যায়, রানী রাসমণির রক্তধারায় ও কর্মের নিরিখে তাঁর যে উচ্চতা, হীনমন্য কারও পক্ষেই তাঁকে সহ্য করা সম্ভব নয়। এই কারণে সমাজের তথাকথিত উচ্চমন্যরা রানী রাসমণিকে ঈর্ষা, হিংসা বা দ্বেষদৃষ্টিতে দেখবে – এটাই তো স্বাভাবিক।

তিনি ছিলেন অব্রাহ্মণ কুলজাতা এবং তদুপরি মহিলা। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মকৃতির সামনে আসলেই অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও সঙ্কুচিত হয়ে যেতেন। তাই উচ্চসমাজের হীনমন্য ব্যক্তিরা সব সময়েই রাণী রাসমণিকেই ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন। সবদিক থেকে রাসমণির বিরাটত্বই অপরের চক্ষুশূল হয়ে ও দাঁড়িয়েছে। তাই কিছু মানুষ রানী রাসমণিকে দূরবীণের উল্টোপীঠ দিয়ে দেখার চেষ্টা ক'রে থাকেন। কারণ এজগতে কেউ কারও থেকে ছোট হতে চান না।
রাসমণি পৃথিবীর বুকে এক অদ্বিতীয় অনুপম ব্যক্তিত্ব এবং ভারতীয় নারীজাতির অনুকরণীয় এক আদর্শ প্রতিমা।

রাণী রাসমণি ভারতীয়, এমন কি, বিশ্বের নারীজাতির অনুকরণীয় এক আদর্শ মডেল। 'ব্রাহ্মণের সমদর্শিতা, ক্ষত্রিয়ের সহমর্মিতা ও ক্ষাত্রতেজ, বৈশ্যের বিষয়বুদ্ধি ও শূদ্রের নিরহংকার সেবাধর্ম – এই সবকটি গুণের সুসমঞ্জস সমন্বয় পবিত্র জননী রানী রাসমণির কর্মকৃতি ও আচার-আচরণের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

---

১৮ এর পৃষ্ঠার পর
১৬৯২ ছিল। ১৭৫৭ ইংরেজ দখল। ১৮১৬ সালে ফরাসী উপনিবেশ। ১৯৫১ সালে ভারতের অংশ; ছাতনা -বাঁকুড়া। বড়ু চণ্ডীদাস স্মৃতি স্থান। বাশুলি মন্দির সমূহ; ছোট দরগা - মালদহ; ছাতিমতলা- শান্তিনিকেতন। পৌষমেলা; জটার দেউল- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রায়দিঘি। ৯৭৫ সাল; জয়রামবাটি - সারদা দেবীর জন্মস্থান, মাতৃমন্দির- ১৯০২; তাম্রলিপ্ত- প্রাচীন বাংলার রাজধানী; দক্ষিণেশ্বর - উত্তর ২৪ পরগনা। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকেন্দ্র; দলমাদল - বিষ্ণুপুর। ১১ ফুট লম্বা কামান; পলাশী- নদিয়া। ১৭৫৭ সালে যুদ্ধে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা; ফিরোজ মিনার- মালদহ। ৮৪ ফুট উঁচু; বর্ধমান রাজবাড়ি- বর্ধমান, মহতব মঞ্জিল, ১৮৫১; বড় দরজা - পাণ্ডুয়া ১৩৪২ বঙ্গাব্দ। জামি মসজিদ, চাঁদখাঁর সমাধি; বিজয়তোরণ - বর্ধমান। ১৯০৪ সালে প্রথম নাম ছিল কার্জন গেট; বিষ্ণুপুর- মন্দির
পরবর্তী অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়

গাজীমেলা ঃ বড়খাঁ গাজীর কাল ও পরিচয় প্রসঙ্গে

দেবীশংকর মিদ্যা

অখণ্ড ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলীর কিছু অংশে, পূর্ব মেদিনীপুর ও অধুনা নিম্ন বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় আজও গাজীমেলা জনপ্রিয়। এই মেলাগুলির সিংহভাগটাই দখল করে আছে, বড়খাঁ গাজী নামে এক সুঠামদেহী, অশ্বারোহী পুরুষ প্রবর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা স্থানে এই লোকদেবতার থান, সমাধি ও স্মৃতিস্তূপ বর্তমান। মাটির ওপর বহু স্থানে একটি স্তুপাকৃতি কিংবা পিরামিড আকৃতির মাটির বা ইটের ঢিবিতে এই দেবতা পূজিত হন। থানে এককভাবে কিংবা কোথাও কোথাও নানা লোকদেবীর সঙ্গেও ইনি সাড়ম্বরে পূজিত হন। সাধারণভাবে প্রান্তিক হিন্দুরাই এই দেবতার ভক্তগোষ্ঠী। কোথাও কোথাও পূজায় হাজীর দ্বারা হাজতের মাধ্যমে এই পূজা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই প্রথাটি অপ্রচলিত হয়ে পড়লেও অদূর অতীতে এটিই ছিল সর্বজনমান্য প্রথা। ২৪ পরগণায় কোথাও কোথাও ইনি বরখান গাজী, বড়পর গাজী বা বড়খাঁ গাজী নামে পরিচিত। এই জেলায় এই দেবতার বাৎসরিক উৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে ঘোড়াদৌড় একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান রায়দীঘি থানার খাড়ি গ্রামে বড়খাঁ গাজী প্রাচীনতম মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে পূজিত হচ্ছেন। তাঁর পশ্চিমপ্রান্তের অনতি দূরত্বে রয়েছে নারায়ণীর থান। মাছ ধরতে, মধু ভাঙতে, কাঠ কাটতে বাউলে, জেলে ও ব্যবসায়ীরা জলপথে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করার প্রাক্কালে এই দেবতাদ্বয়ের পূজা ও আদেশ না নিয়ে যান না। গাজীমেলার মধ্যমণি এই বড়খাঁ গাজীর পরিচয় প্রসঙ্গে নানা মুনি নানা মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধ আমরা এই প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলবো।

।। এক ।।

মাননীয় বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে এবং অপরাপর গবেষক কিছু প্রবন্ধে ঘুটিয়ারি শরিফের মোবারক গাজীকে বড়খাঁন গাজী রূপে পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, মদনের গান বা মদন পালা নামে একটি কাহিনিতে গাজীর সঙ্গে বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মদন রায়ের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। 'কাহিনীর বিষয় হল, নবাবের কাছে খাজনার দায়ে পড়েছিলেন মেদনমল্ল পরগনার জমিদার মদন রায়। তাঁকে এই দায় থেকে উদ্‌ধার করেন পীর বড়খাঁ গাজী।' গবেষকদের এই বিশ্বাসের কারণ রায়মঙ্গল কাব্যের এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুঁথির কবি কৃষ্ণরাম দাসের কয়েকটি পঙক্তি। পুষ্পদত্ত সদাগর পিতা দেবদত্তের অন্বেষণে পাটনে যাবার প্রাক্কালে এক নৃপতির কাছে আদেশ নিতে যান। তাঁর নাম মদন নৃপতিঃ 'দিব্য সিংহাসন মাঝে/ কৌতুকে বসিয়া আছে / মদন নৃপতি গুণাকর।' ওই পুঁথিতে অন্যত্র এঁকে নৃপবর ও মহীপাল বলা হয়েছে। সুতরাং পুঁথি অনুযায়ী নৃপতি মদনের সময় বা কিছুটা আগে দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবার অর্বাচীন মদনপালা গ্রন্থে মেদনমল্ল পরগনার

জমিদার মদনরায় মোবারক গাজীর ভক্ত ও অনুগৃহীত রূপে বর্ণিত। মোবারক গাজীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মদনরায় ও রায়মঙ্গল সংশ্লিষ্ট মদন নৃপতিকে একই ব্যক্তি কল্পনা করে উল্লেখিত গবেষকগণ মোবারক গাজী ও বড়খাঁ গাজীকে একই ব্যক্তি রূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল রচিত হয়েছিল ১৬০৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর আগে আর একজন কবি এই রায়মঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। তিনি হলের মাধব আচার্য্য। মাধব আচার্য্য নাম উল্লেখিত হয়েছে কৃষ্ণরাম দাসেরই পুঁথিতে। স্বয়ং দক্ষিণরায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে তাঁর মঙ্গলগীত রচনার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন –

পূর্বে করিল গতি মাধব আচার্য
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য।
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।।

অর্থাৎ কৃষ্ণরাম দাসের বহু আগে রচিত মাধব আচার্যের রায়মঙ্গল কাব্য অপ্রচলিত হয়ে পড়লে কৃষ্ণরাম দাস তাঁর মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন। মঙ্গল সাহিত্যে মাধব আচার্য্য নামে এক প্রাচীন কবির কথা আমরা জানি। তিনি চণ্ডীমঙ্গল সহ আরও কয়েকটি কাব্য লিখেছিলেন। কবি মুকুন্দরামের প্রায় পরবর্তী সময়ে এই কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। মাধব আচার্য্যের পুঁথি থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তদ্বীপ স্থল
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।
যাগযজ্ঞে জপেতপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর
মর্যাদার মহোদধি দানে কল্পতরু
আচার বিচারে বুদ্ধে সম সুর গুরু।
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য।

অন্যত্র কবি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন –

পরাশর সুত হয় মাধব তাঁর নাম
কলিযুগে ব্যাস তুল্য গুণে অনুপাম।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এবং কবির পুঁথি পড়ে প্রত্যয় হয় পরাশর নন্দন মাধব আচার্য্য দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গার তীরে কোথাও বাস করতেন। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে কবি চট্টগ্রামে চলে যান। কবি তাঁর সারদামঙ্গল কাব্যটির রচনাকাল জানিয়েছেন –

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত।

শব্দগুলির সংখ্যামান হল ১০৫১। অঙ্কস্য বামা গতি ধরলে অব্দটি হয় ১৫০১ শকাব্দ। সুতরাং ১৫০১+৭৮= ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ। কবি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে সারদা মঙ্গল পুঁথিটি

রচনা করেন। এই রচনার বহুকাল পূর্বে যুবা বয়সে কবি যখন দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গা তীরবর্তী কোন গ্রামে থাকতেন তখন রায়মঙ্গল কাব্যটি লিখেছিলেন বলে অনুমান করি। মঙ্গল কাব্যের যত প্রাচীন পুঁথি রচিত হয়েছে তার কাহিনি কাল অপেক্ষা বহু প্রাচীন। গ্রন্থ রচনার পূর্বে লোকমুখে ও গায়েনদের মুখে এই গান ঘুরতো। তারপর একসময় এইগুলি কাব্যের রূপ পায়। এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম রায়মঙ্গল গীত কৃষ্ণরাম দাসের পুঁথির রচনাকাল থেকে কম করে একশত বছর আগেও অর্থাৎ ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগেও প্রচলিত ছিল।

মদনপালার মোবারক গাজীর কাহিনিতে কোথাও মোবারক গাজীকে 'খাঁ' বা 'বড়খাঁ গাজী' বলা হয়নি কিংবা পাঁচপীরের এক পীরও বলা হয়নি। মোবারক গাজীর জীবনীতে 'খনিয়া' 'খাড়ি', 'সোনারপুর', 'চম্পাবতী', কিংবা 'মুকুটরায়ের' কোনও উল্লেখ নেই। মোবারক গাজীর মান্যতা খুবই আঞ্চলিক। কেবল বারুইপুর বাঁশড়া অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দক্ষিণরায় এবং বড়খাঁ গাজীর কাহিনি অপেক্ষা মোবারক গাজীর কাহিনি অর্বাচীন।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে রচিত "গাজীর গান", 'মদন পালা' কিংবা 'মদনের গান' এবং রামচন্দ্রের 'হরপার্বতী মঙ্গল' পুঁথিতে লিখিত মেদনমল্ল পরগনার মদনের দুটি সময়ের কথা জানা যায়। একটি শায়েস্তা খাঁর, অপরটি মুর্শিদকুলির সমসময়ে মদনের উপস্থিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয়কালের মধ্যে শায়েস্তা খাঁর কাল প্রাচীনতর। মদনপালায় লেখা হয়েছে –

ঢাকা কোটে নবাব বসে নাম সায়িস্তা খাঁ
ইনসাফ আদালত নবাব কিছু করেনা।
অই রায়রেএ আছে দুটি দস্ত করে জোড়া
মদনমল্লের কাগজ যতো করে নাড়াচাড়া।
দপ্তর খুলে তুরক তুলো করে লেখাজোকা
মদন রায়ের বাকী দেখে তিনসনি টাকা।

জমিদার মদন রায়ের ভয়ংকর বিপত্তি থেকে বাঁচান মোবারক গাজী। বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় উপস্থিত হয়েছিলেন ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ। অপরদিকে মুর্শিদাকুলি সময়কাল ১৭০৫-১৭২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই সময়টা মেদনমল্ল পরগনার মদনের কাল বলে বহু গবেষক জানিয়েছে। যাই হোক, মদনরায়ের কাহিনি কোনক্রমে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে স্থান দেওয়া যায় না। ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বড়খাঁ গাজী ও দক্ষিণরায়ের কাহিনি অন্ততঃ ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী নয়। এখন প্রশ্ন দক্ষিণরায় বড়খাঁ গাজীর কাহিনি কত প্রাচীন? এই কাহিনির প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে দক্ষিণরায়ের পরিচয় জানা আবশ্যক।

।। দুই ।।

কবি কৃষ্ণরাম দাসের স্বপ্নে দেখা দিয়ে স্বয়ং দক্ষিণরায় তাঁর পরিচয় উদঘাটিত করেছেন ঃ-

মুনি মুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর।।
আপনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন।
বসাইল নবরাজ্য কাটিয়া কানন।।
বিবাহ করিনু ধর্মকেতুর কুমারী।
দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি।
হরহর দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।
প্রথমে লইল পূজা পাটনে ছলিয়া।

উপরের পঙক্তিগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণরায়ের পিতা ছিলেন নৃপতি প্রভাকর। ইনি সদাশিব বা মহাদেবকে তুষ্ট করে পুত্র লাভের বর পেয়েছিলেন। স্বয়ং মহাদেব তাঁর পুত্র হয়ে জন্মলাভ করেন। তিনি ধর্মকেতুর কন্যা লীলাবতী বা নীলাবতীকে বিবাহ করেন এবং দক্ষিণের ঈশ্বর হন। মর্তলীলা অবসানে তিনি এবং তাঁর পত্নী যোগে তনু ত্যাগ করে আবার কৈলাসে ফিরে যান। আঞ্চলিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে দক্ষিণরায় ছিলেন শিবের বরপুত্র বা শিবপুত্র বা স্বয়ং শিব, যিনি দক্ষিণরায় রূপে জন্মলাভ করেছিলেন। জাগতিক দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন রাজা প্রভাকরে পুত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়াশীর পাশ্ববর্তী কাটানদীঘি গ্রামের জনৈক গাজী পরিবারে রক্ষিত একটি পুঁথি থেকে জানা যায়, রায়প্রভাকর নামে এক রাজা ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ খাড়ি জনপদে রাজত্ব করতেন। তিনি বড়াশীর শিবের ভক্ত ছিলেন। পুঁথিতে তাঁকে গোঁসাই রাজা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি সুন্দরবনের এক রাজার গুরু স্থানীয় পুরোহিত ছিলেন। পরে শিবের নির্দেশে তিনি খাড়ি জনপদের রাজকার্যের দায়িত্ব নেন। রাজা প্রভাকরের স্ত্রীর নাম ছিল নারায়ণী। এলাকার মানুষ তাকে দুর্গার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। এই তথ্যের সত্যতা সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা যায়নি। করাণ পুঁথির কয়েকটি পাতা মাত্র দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাই ইতিহসের তথ্য হিসাবে এটি নির্দ্ধিধায় গ্রহণ করা যায় না। তবে পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে এর সত্যতা যাচাই করা যায়।

কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল অনুযায়ী দক্ষিণরায় ছিলেন আঠারো ভাটির ঈশ্বর এবং খাড়ি জনপদে ছিল তাঁর প্রাসাদ –

খাড়ির বাড়িতে রায় লইয়া পরিবার।
বটেবেনে আসিয়া কহিল সমাচার।

পিতার উত্তরসুরী হিসাবে দক্ষিণারায় খাড়ি জনপদের রাজা হয়েছিলেন। দক্ষিণরায়ের পিতা যে গোঁসাই ছিলেন তা রায়মঙ্গলে বড়খাঁ গাজী দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে অশ্রাব্য গালিগালাজের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন –

শুনিয়া হারামজাদ মহলিয়া ফোদ।
গোসাঞি পয়দা কিয়া সার বেটি '. . .'।

গালিগালাজের মাধ্যমে বড়খাঁ গাজী দক্ষিণরায়কে বলেছেন, তার মতো এমন

হারামজাদা ফন্দিবাজকে গোঁসাই কেমন করে জন্ম দিলো। এই কথোপকথন থেকে সুস্পষ্ট দক্ষিণরায়ের পিতাকে গোঁসাই হিসাবে অভিহিত করা হতো। এবং ওই পুঁথিতে অনেক স্থলে দক্ষিণরায়কেও গোঁসাই বলা হয়েছে। লোকসংস্কৃতির গবেষক মাননীয় ধূর্জটি নস্কর তার একটি প্রবন্ধে 'ফোদ' শব্দটি উদ্ধৃত করে জানিয়েছিলেন দক্ষিণরায় সুন্দরবনের অন্যতম জাতিগোষ্ঠী পৌন্ড্রক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত হতে পারেন। তিনি মনে করেছিলেন 'ফোদ' শব্দটি জাতিবাচক 'পোদ' শব্দের বিকৃত রূপ। কিন্তু বোধহয় পরবর্তী পঙক্তিগুলি লক্ষ্য করেন নি তিনি। সুন্দরবনে গোঁসাই শব্দ সমকালে ব্রাহ্মণ ও যুগি জাতি গোষ্ঠীর পুরহিতদের বোঝাতো। দক্ষিণরায় যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা সমকালীন বহু পুঁথির সাক্ষ্যে প্রমাণ করা যায়। দক্ষিণরায় যখন তাঁর ভক্তদের দেখা দিতেন, তখন ব্রাহ্মণ বেশেই দেখা দিতেন। দক্ষিণরায়, কালুরায়, গাজী ও বনবিবি বিষয়ক পুঁথিগুলিতে তার ভুরিভুরি প্রমাণ আছে। এমনকি সুন্দরবনের গায়েনরা বংশ পরম্পরায় দক্ষিণরায়ের যে গান করেন তাতেও দক্ষিণরায়কে ব্রাহ্মণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। দক্ষিণরায়ের কাধে পৈতে, মাথায় সোনার ছাতা এবং হাতে বেত নিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে তার ভক্তদের দেখা দিতেন। কবি কৃষ্ণরামদাসের পুঁথিতেও দক্ষিণরায়কে ব্রাহ্মণের গরিমা দেওয়া হয়েছে–

নম নম লীলাবতীপতি মহাশয়।
নিবারণ করহ বড়ই পাই ভয়।।
পরমপুরুষ তোমা পরতেক জানি।
পরমাদে রাখ দাসসূতের পরাণি।।
ফণিবর যিনি ভুজ তুমি সে ঠাকুর।
ফাফর হইলাম বড় ভয় কর দূর।।

দক্ষিণরায় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই তাকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করা হয়েছে। পরে আমরা যখন মুকুট রাজার কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করবো তখন জাতি পরিচয় সুস্পষ্ট হবে। প্রসঙ্গত বলি, "ফোদ' শব্দটি ফিন্দি' বা 'ফোন্দ' থেকে আসতে পারে যার অর্থ হল ফন্দিবাজ।

মাননীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণরায়কে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বলে মন্তব্য করেছেন। খ্রিস্টিয় একাদশ দ্বাদশ শতকে সহজযান ও বজ্রযান নামক তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে প্লাবিত ছিল সুন্দরবন তথা খাড়ি অঞ্চল। এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সেই সাক্ষ্য দেয়। বাংলার যুগিজাতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তারা বৌদ্ধমত থেকে বেরিয়ে এসে নাথপন্থার উদ্ভব ঘটায়। তাছাড়া কবি কৃষ্ণরামদাস তার রায়মঙ্গল কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তি অংশে লিখেছেন

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।।

'মহাজন' কেবল মহান ব্যক্তি অর্থবোধক সরলার্থে ব্যবহৃত নাও হতে পারে। বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধাচার্যদের 'মহাজন' বলা হতো। তাই শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা হয় বইকী। যাইহোক এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, দক্ষিণরায়ের কেন্দ্রীয় স্থানটি খাড়ি এবং ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই বা ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি তার

কাল।

।। তিন ।।

দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজীর কাহিনির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মুকুট রাজা ও তার কন্যা চম্পাবতী। যশোর খুলনার ইতিহাসকার মাননীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মুকুট রাজার শাসন কেন্দ্রকে বাংলাদেশে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই কাহিনিকাল স্থির করেছিলেন সুলতান হুসেন শাহের সমসময়ে অর্থাৎ ১৪৯৩- ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সেই সময় এই পথ দিয়ে নীলাচলের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু পদব্রজে চলেছেন।তখন খাড়িছত্রভোগে শাসনকর্তা রূপে রয়েছেন সুলতানেরই রাজকর্মচারী রামচন্দ্র খাঁ। তখন এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সুলতানের অনুগ্রহভাজন কুলীন গ্রামের বসু বংশীয়রা ক্ষমতায় আসীন। সুতরাং এই সময়ে দক্ষিণরায়কে স্থান দেওয়া যেতে পারেনা। তাঁর কাল আরও প্রাচীন। বিপুলভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেই মিত্র মহাশয় এবং তাঁর অনুগ্রামী গবেষকগণ মুকুটরায়কে বাংলাদেশে টেনে দিয়ে গেছেন।

কবি কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গল এবং অপরাপর পুঁথি থেকে জানা যায়, দক্ষিণরায় এবং বড়খাঁ গাজীর যুদ্ধ হয়েছিল খনিয়ায়–

দলবল বাঘের লইয়া মহাকায়।
ধাইল উত্তরমুখে দক্ষিণের রায়।
উত্তরিল খনিও আসিয়া অবিলম্ব।
হইতে লাগিল হুড়াহুড়ির আরম্ভ।।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আদিগঙ্গার পূর্বদিকে ময়দা, খনিয়া, শাহাজাদাপুর, বিজয়নগর, মজিলপুর গ্রামগুলি অবস্থিত। অধুনা খাড়ি গ্রামের উত্তর দিকে এই গ্রামগুলির অবস্থান। বড়খাঁ গাজী মুকুটরায়কে ধ্বংস করে খনিয়ায় আস্তানা করেছিলেন। মুকুটরায়ের মেয়ে চম্পাবতীকে বিয়ে করেন বড়খাঁ গাজী। চম্পাবতীকে বিয়ে করার ব্যাপারে বড়খাঁ গাজীকে সাহায্য করেছিলেন দক্ষিণরায়। খনিয়ার যুদ্ধের আগে সেইজন্য বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের দোস্তানি ছিল। কিন্তু সেটা সাময়িক। পরে দক্ষিণরায়ের সংগে খনিয়ায় একটি অন্তিম মহাযুদ্ধ হয়েছিল। ওই যুদ্ধের প্রাক্কালে দক্ষিণরায় বড়খাঁ গাজীকে পূর্বের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন–

পায়েতে পড়িলে পূর্বে মনে নাই এটা।
গোস্ত খাইয়া মস্ত হইলে দোস্ত আর কেটা।।
মুটুক বামনের বেটি লইয়া আইলেক কাড়্যা।
ইমান এমনি বটে কর্মা বাটপাড়্যা।।
আমা হইতে পীরহইল শিরনি পায়েন।
খাইতে আনিলাম কুচে '..' ধায়ন।

মুকুটরায়ের রাজধানী ছিল অধুনা বিজয়নগর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর

থানার অন্তর্গত। মুকুটরায়ের কীর্তিচিহ্ন, প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আজও বিদ্যমান। মুকুটরায় নামাঙ্কিত বিশাল পুকুর এবং প্রত্ন সমৃদ্ধ ঢিবিগুলি এখানকার প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। মুকুটরাজা, রাজকন্যা চম্পাবতী, কালুগাজী ও বড়খাঁ গাজীর কাহিনিগুলি এখানে আজও সজীব। বিজয়নগর, শাহাজাদাপুর। সন্নিহিত গ্রামগুলি থেকে প্রচুর প্রত্নবস্তু আহরিত হয়েছে। পুকুরের পাড়, ঢিবি এবং মাঠগুলি থেকে ধূসর মালসা জাতীয় পাত্র, জলনালী যুক্ত মৃৎপাত্র, থালা জাতীয় পাত্র, ধুনুচি, শঙ্খ আকৃতির পাত্র, মুন্ড বা বারামূর্তি, ছোটছোট পোড়ামাটির শিবলিঙ্গ, ছোটছোট স্তুপাকৃতি গুটি, মাল্যগুটিকা, পোড়ামাটি ও পাথরের বাসনকোসন, নির্দিষ্ট আকারের পোড়ামাটির উট, ত্রিচূড় যক্ষিনীর ভগ্নাংশ, প্রাগ্‌বঙ্গলিপির কেক ও ভাঙ্গা বৃদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এই প্রত্নবস্তুগুলির সময়কাল খ্রিস্টিয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে বলে বিবেচিত। পুকুর খননের সময় এক দশক আগে এখান থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি বিশাল আকারের শিবলিঙ্গ। বহুবার বন্ধুবর উৎপল পাল, প্রত্নগবেষক ও সংগ্রাহক দীনবন্ধু নস্কর ও লোকসংস্কৃতির গবেষক সঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে গ্রামগুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি। সাম্প্রতিক ক্ষেত্র সমীক্ষায় এই প্রতিবেদক এবং সঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ রূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এখানে পুকুর দেখিয়ে বয়োবৃদ্ধরা বলেন, এটি সেই অমৃত কুন্ড বা জীয়ন্ডকুন্ড, যুদ্ধের সময় যখন মুকুটরায়ের সৈন্য ও ঘোড়ারা মারা যেতো তখন এই কুন্ডের জল ছিটিয়ে দিয়ে রাজা তাদের বাঁচিয়ে দিতেন। কিন্তু পরে এই রহস্য জানতে পেরে বড়খাঁ গাজীর অনুচরেরা কুন্ডের জলে গরু হত্যা করে ফেলে দিয়ে জলের পবিত্রতা নষ্ট করে। আর একটি পুকুর দেখিয়ে বলেন, এখানে মুকুটরায়ের আত্মীয় স্বজনেরা আত্মহত্যা করেছিলেন। এখানকার দুটি পুকুর বিখ্যাত। একটি রামসাঁতালের দীঘি, আপরটি মণিপুকুর। ‘মণি’ শিবের অপর নাম। নানা ধরনের গল্প এখানকার মাটির পরতে পরতে মিশে আছে। রায়মঙ্গল, কালু গাজীর গান, গাজীর গান প্রভৃতি তথ্য থেকে জানা যায়, মুকুটরায় ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং শিবভক্ত। তার রাজধানীতে মুকুটেশ্বর নামে একটি শিবমন্দির ছিল। তিনি শিবপূজা না করে জলগ্রহণ করতেন। কোনও কোনও গ্রন্থে লেখা হয়েছে মুকুটরায়ের রাজত্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে ফরিদপুর থেকে পশ্চিমে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ-৬১)।তবে এই তথ্যের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়না।

এহেন মুকুটরায়ের প্রধান সহায় ছিলেন তার স্বজাতি ও আত্মীয় দক্ষিণরায়। মুসলমানী কেতাবে লেখা হয়েছে–

দক্ষিণা নামেতে রায়রাজার গোসাঞি
তার সমতুল বীর ত্রিভুবনে নাই।।

পাঠকবর্গ উপরের পঙক্তিতে লক্ষ্য করবেন দক্ষিণরায়কে দক্ষিণ ও মুকুটরাজার গোঁসাই বলা হয়েছে। মুকুটরাজা যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা রায়মঙ্গল ও গাজীর গানে বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে আমরা দেখেছি। সুতরাং মুকুটরায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায় তার গোঁসাই অর্থাৎ

তার স্বজাতীয় এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন। দক্ষিণরায়ের একজন সাহায্যকারী ছিলেন তিনি কালুরায়। এই কালুরায়ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর সহযোগী কালু গাজীর কোন সম্পর্ক নেই। দুজন পৃথক ব্যক্তি। কালুরায়ের দ্বারা দক্ষিণরায় হিজলীতে প্রেরিত হয়েছিলেন তা রায়মঙ্গলে লিখিত হয়েছে।

বড়খা গাজী সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার করতে এসে বর্ণহিন্দু দ্বারা শোষিত নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীকে নিজের দিকে টানতে পেরেছিলেন। তিনি সুন্দরবনের বহুস্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শোষিত সুন্দরবনবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হরিপুরকে সমৃদ্ধশালী সোনারপুর বানিয়েছিলেন। এহেন বড়খাঁ গাজী মুকুটরাজার কন্যা চম্পাবতীর রূপলাবণ্যে মজেছিলেন। তিনি তার সঙ্গী কালুগাজীকে কারারুদ্ধ করলেন। বড়খাঁ গাজী সোনারপুর থেকে নৌকাপথে বিজয়নগর আক্রমণ করলেন। কিন্তু দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠলেন না। বড়খাঁ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। পরে অধিক সংখ্যক সৈন্য এনে দক্ষিণরায়ের অবর্তমানে অতর্কিতে আবার বিজয়নগর আক্রমণ করলেন। ভয়ংকর যুদ্ধ বাধলো। বিজয়নগর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণতহল। দক্ষিণরায় দ্রুতগতিতে বিজয়নগরে দিকে ধাবিত হলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে মুকুটরায় যুদ্ধে হত হয়েছেন। তার আত্মীয়স্বজন ও পুত্রগণ কুন্ডে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। চম্পাবতীকে বন্দী করা হয়েছে। দক্ষিণরায় তখন বাধ্য হয়ে গাজীর সঙ্গে চুক্তি করলেন। গাজীর সঙ্গে চম্পাবতীকে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণরায় বড়খাঁ গাজীকে সেই দোস্তানির কথা স্মরণ করিয়ে কটুক্তি করেছিলেন– তা ইতিপূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি। গাজী কালু ও চম্পাবতী গীতে অবশ্য জানানো হয়েছে বড়খাঁ গাজী 'ব্রাহ্মণ' দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর সাময়িক দোস্তানি হয়েছিল। কবি কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গলে এই দোস্তানির কথা জানানো হয়েছে –

> শুন্যাছ বড়খাঁ গাজী পরতেক পীর।
> ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠারো ভাটির।।
> দুইজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে।
> তারপর হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে।

এই ঘটনার পর চম্পাবতীকে ধর্মকর্ম ও সমাজসেবায় নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। নিম্নবর্গীয় মানুষের হৃদয়ে তিনি একটি স্থান করে নেন। তাঁর মৃত্যুর পর বহুস্থানে তার নামে দরগা তৈরি হয়। তার অবিস্মরণীয় জীবনের কীর্তিকাহিনি সুন্দরবনের নানা অঞ্চলে আজও স্তুত হয়। শোনা যায়, এই চম্পাবতীর সংস্পর্শে এসে বড়খাঁ গাজীর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। বড়খাঁ গাজী হয়ে ওঠেন সুন্দরবনের নিম্নবর্গীয় মানুষের দেবতা স্বরূপ। বিজয়নগর, শাহাজাদাপুর, খনিয়া, খাড়ি প্রভৃতি গ্রামের ভূমিস্তরের প্রত্নবস্তু এবং লোকসংস্কৃতির ধারা বিচার করে ধারনা হয় চম্পাবতী, মুকুটরায় ও বড়খাঁ গাজীর এই কাহিনি ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে ও পরে ঘটে থাকতে পারে।

। চার ।।

দক্ষিণরায?ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর দোস্তানি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ভাটির অধিকার নিয়ে খনিয়ায় দুজনের মধ্যে আবার প্রবল যুদ্ধ বাধে। তবে এই যুদ্ধের আগে দক্ষিণরায় বনবিবির সঙ্গে আর একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বনবিবিও সুন্দরবনে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারে। 'বনবিবির জহুরনামা থেকে জানা যায়, দক্ষিণরায় বনবিবির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণী। তবে বনবিবির জাগতিক বা ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে এই প্রাবন্ধিকের সন্দেহ রয়েছে। যাইহোক, অধুনা খাড়ি গ্রামে একটি বিশাল পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নারায়ণীর সুপ্রাচীন দালান মন্দির রয়েছে। এটি সেন আমলে প্রাচীন মন্দিরের তলপত্তনের উপর সুলতানী আমলে তৈরি। নারায়ণী মন্দিরের অদূরবর্তী পুকুরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে বড়খা গাজীর একটি ছোট কিন্তু সুন্দর মন্দির রয়েছে। ঘোড়ার পিঠে সুঠাম মূর্তি। কাঠের তৈরি। নারায়ণী মূর্তিটিও পূর্বে কাঠের ছিল। পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে দক্ষিণরায়ের মন্দির ছিল। সেটি এখন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেন আমলে খাড়ি বিষয় ও খাড়ি মন্ডলের স্নায়ুকেন্দ্র ছিল অধুনা এই খাড়ি গ্রাম। এককালে আদিগঙ্গা বিশাল খাড়ি জনপদকে পশ্চিম খাড়ি ও পূর্ব খাড়িতে বিভক্ত করতো। পশ্চিম খাড়ি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভূক্ত এবং পূর্ব খাড়ি পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান খাড়ি গ্রামটি সেন আমলে পূর্ব খাড়িতে বিদ্যমান ছিল। ডাকার্নতন্ত্র অনুযায়ী খাড়ি চৌষট্টি শক্তিপীঠের এক পীঠ। বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজযানের সাধন কেন্দ্র ছিল খাড়ি। সেন আমলের শেষে সুপ্রাচীন বৌদ্ধতান্ত্রিক নারায়ণীদেবী দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। ঠিক তেমনিভাবে সুপ্রাচীন ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন প্রভৃতি রায়নামান্ত সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত শিবের সংমিশ্রণের সঙ্গে দক্ষিণরায় একীভূত হয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন পশু পূজা ও মুণ্ডপূজার ধারা দক্ষিণরায় আত্মসাৎ করে নিয়ে সুন্দরবনে দেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুন্দরবনে মুন্ডপূজার ধারা বহু প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে এই পূজা প্রাগৈতিহাসিক কালের। সুন্দরবন অঞ্চল থেকে নানা ধরনের অজস্র মুন্ডমূর্তি সংগৃহীত হয়েছে। এই মুন্ডমূর্তিগুলি এই জেলার বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। কাশীনগরের সুন্দরবন প্রত্নগবেষণাকেন্দ্র সংগ্রহশালায় রয়েছে বিভিন্ন সময়কালের শতাধিক মুন্ডমূর্তি। নব্যপ্রস্তর, তাম্রশ্মীয়, আদিঐতিহাসিক ও ইতিহাস যুগে এই মুন্ডমূর্তিগুলি উপাসিত হতো বলে জানা গিয়েছে। এমনকি এখনও এই মুন্ডপূজার ধারা 'বারা' নামে জনজাতির মধ্যে বহমান। এই অঞ্চলে বাঘের পিঠে পঞ্চানন অসুলভ নন। আবার খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে বাঘের পিঠে দক্ষিণরায়ের মূর্তিও হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া গেছে। সুতরাং রায়নামান্ত দেবতাদের একটি ধারা (স্মর্তব্যঃ ধর্মঠাকুর ও পঞ্চাননকেও রায় বলা হয়েছে) সুন্দরবন অঞ্চলে বহমান ছিল। সেই ধারাটি সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কারণে মধ্যযুগে দক্ষিণরায়ে বর্তায়। দক্ষিণরায়ের স্ত্রীর নাম জানানো হয়েছে নীলাবতী বা লীলাবতী। লীলাবতীর সঙ্গে ধর্মঠাকুর ও শিব উভয়েই জড়িত। ঝাঁপের সময় নীলঘর তৈরি করা, নীলঘরে বাতি দেওয়া একটি অবশ্য পালনীয় রীতি। দক্ষিণরায় যে ওই একই সংস্কৃতির

বিবর্তিত রূপ তা সহজেই অনুমেয়। দক্ষিণরায়ের এই মিশ্রিতকরণ কবি কৃষ্ণরামদাসের পুঁথি লেখার বহু আগেই ঘটেছিল। যদিও কবি কৃষ্ণরামদাস তার পুঁথিতে জানিয়েছেন, যুদ্ধের সময় বড়খাঁ গাজীর দ্বারা দক্ষিণরায়ের মায়ামুন্ড ছিন্ন হয়ে ভূতলে পড়ে বারাপূজা বা মুন্ডাপূজার সূত্রপাত–

কাটামুন্ড বারাপূজা সেই হইতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে।।

খটির নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের সুন্দরবনের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণ কোনও ভাবেই ত্রয়োদশ শতকের পরে ঘটতে পারে না। কারণ প্রায় ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেনরাজারা এবং তাদের সামন্ত অনুসারী রাজারা এই অঞ্চলে ক্ষমতাসীন ছিলেন। রাক্ষসখালি দ্বীপে মহারাজ ডোম্মনপালের যে তাম্রশাসনটি পাওয়া গিয়েছিল তাতে উৎকীর্ণ ছিল ১১১৮ শকাব্দ বা ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দ, যে সময়ে ব্রাহ্মণকে একটি গ্রাম দান করা হয়েছে। তখনও কিন্তু লক্ষণসেন জীবিত। পরবর্তী সময়ে এই বঙ্গ সূর্যসেনের অধীন ছিল। পুঁথি পাতা থেকে জানা যাচ্ছে, ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের পরেই সেনবংশের কোনও পুরোহিত মুসলিম আক্রমণ ঠেকাতে আঞ্চলিকভাবে রাজকার্য্য নিজেদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হন। সুতরাং ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের পরেই রায় প্রভাকর বা মুকুটরায় আর্বিভূত হন। ডাকার্নবের পুঁথি থেকেও বোঝা যায় খাড়ির তান্ত্রিকদেবী নারায়ণী ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দের শেষেই দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণীর সঙ্গে একীভূত হন। কবি কৃষ্ণরামদাস গ্রন্থ আরম্ভ করেছিলেন প্রাচীনতর কবি মাধব আচার্যকে স্মরণ করে। মাধব আচার্যের পুঁথিতে বড়খাঁ গাজীর প্রসঙ্গ ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ সুন্দরবনের বহু গায়েন রায়মঙ্গল পালার গান করেন সেখানে বড়খাঁ গাজী প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। আছে কেবল শিবের বরে দক্ষিণরায়ের জন্মকথা, বাল্যলীলা, লীলাবতীর সঙ্গে বিবাহ, সুন্দরবনে রাজ্য পত্তন এবং বণিক প্রসঙ্গ রয়েছে। হুবহু চন্ডীমঙ্গলের মতই। দক্ষিণরায় কবি কৃষ্ণরাম দাসকে দেখা দিয়ে তার কাহিনির যে সূত্র দিয়েছিলেন তাতেও বড়খাঁ গাজীর প্রসঙ্গ ছিলনা। কৃষ্ণরামদাস ও অপরাপর কবিগণ (হরিদত্ত, রুদ্রদেব প্রমুখ) তাদের কাব্যে বড়খাঁ গাজীর কাহিনি সংযুক্ত করেছেন সময়ের দাবিতে। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও নানান পুঁথির তথ্য থেকে অনুমিত হয়, তুর্কি আক্রমণের প্রায় প্রাক্কালে বা সমসময়ে মাধব আচার্যের রায়মঙ্গল পুঁথিটি লিখিত হয়েছিল বড়খাঁ গাজীর কাহিনি ছাড়াই। এই কাহিনিকেই উপজীব্য করে কৃষ্ণরামদাসের মতো কবিরা সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের কাব্যগুলির জন্ম দিয়েছেন। তাঁদের কাহিনির লোকনায়ক দক্ষিণরায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কিছুটা আগে ও পরে আর্বিভূত হতে পারেন।

।। পাঁচ ।।

এখন প্রশ্ন কে এই বড়খাঁ গাজী। সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলামীকরণে এসে সারা বাংলা জুড়ে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বনবিবির সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধে তিনি মধ্যস্থতা করেছিলেন। আমরা এই প্রবন্ধে বনবিবি সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিনি। এটি একটি পৃথক প্রবন্ধের দাবী রাখে। আমি বিশ্বাস করি, বনবিবি সুন্দরবনের বনচন্ডীর বিবর্তিত

রূপ। যাইহোক, দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর শেষবারের মতো খনিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর আবার দুজনের মধ্যে সহাবস্থান ঘটে এবং দুজনেই সুন্দরবন অঞ্চলে পূজা পেতে থাকেন। রায়মঙ্গল কাব্যে কবি কৃষ্ণরামদাস লিখেছেন:

রায়ের আঠারো ভাটি আমল সমস্ত।
গাজীর আমল তাহে ঠাকুরের দোস্ত।।
একের পূজায় দুইজন সুখী বরে।
তার সাক্ষী দেখভাই নিকটে নিকটে।।

উপরের পঙক্তিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, খনিয়ার যুদ্ধের পর সুন্দরবনের সম্পূর্ণ আঠারোভাটি জুড়ে দক্ষিণরায়ের রাজত্ব অটুট রয়েছে। বড়খাঁ গাজী খুশী ঠাকুর দক্ষিণরায়ের দোস্তানিতে। সুতরাং খনিয়ার যুদ্ধের পর যেকোন কারণেই হোক বড়খাঁ গজী বাধ্য হয়েছিলেন দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সন্ধিতে আসতে। এই সন্ধিকে সামনে রেখে বড়খাঁ গাজীর সন্ধির বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁর পরিচয় উদঘাটনে আমরা ব্রতী হবো।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, বড়খাঁ গাজীর কাল সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করেছেন। যশোর খুলনার ইতিহাসবেত্তা সতীশচন্দ্র মিত্র বড়খাঁ গাজীর সময়কাল নির্ধারণ করেছিলেন ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু এটা যে বিভ্রান্তিমূলক খাড়ি ছত্রভোগের সমকালীন ইতিহাস থেকে আমরা দেখিয়েছি। গাজীকালু ও চম্পাবতী পুঁথিতে বড়খাঁ গাজীকে দিল্লীর সুলতান সেকেন্দারের এক পুত্র বলা হয়েছে। সেকেন্দার শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন ১৩৫৯ থেকে ১৩৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অপরদিকে বেশ কিছু মুসলমানী পুঁথিতে এবং কিস্সা কাহিনিতে সেকেন্দার শাহের নাম প্রতীকিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে তাঁর রাজত্বকাল পৃথক পৃথক সময়ে। সুতরাং ১৩৯২ খ্রিস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে বড়খাঁ গাজী প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন তা নির্দিধায় বলা যায় না। তাছাড়া মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ওই সময়কালে অতি প্রভাববান বড়খাঁ গাজী নামে কোনও চরিত্রকে পাওয়া যায় না। বড়খাঁ গাজী হলেন পাঁচপীরের প্রধান পীর। নদীমাতৃক সুন্দরবনে তার জয়ধ্বনি না দিয়ে মাঝি মাল্লারা নৌকা ছাড়েননা। তার পরিচয় রহস্যময় হয়ে থাকার কথা নয়। এই ধরণের প্রভাবশালী গাজী যদি রক্ত মাংসের চরিত্রের হন তবে ইতিহাসের পাতায় কোথাও না কোথাও তার উল্লেখ থাকবেই।

কালুগাজী ও চম্পাবতী গীতে একটি কাহিনি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুকুটরায়ের রাজধানী থেকে চম্পাবতীকে নিয়ে যাওয়ার পথে বড়খাঁ গাজী দেখলেন, আদিগঙ্গার কূলে তিনশত যোগী তপস্যায় নিরত আছেন। তখন বড়খাঁ গাজী গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করে যোগীদের অভীষ্ট কমলেকামিনী দর্শন করান। বড়খাঁ গাজীর এবং তার ধর্মের ক্ষমতা দেখে যোগীরা তখন মাথায় জটা কেটে কমলা পড়ে মুসলমান হন। বড়খাঁ গাজী ছিলেন গঙ্গার ভক্ত। গঙ্গার উপাসক এক বড়খাঁ গাজীকে আমরা ইতিহাসে পাই।..

তুর্কি রুকনুদ্দিন ফিরুজ শাহ তখন বাংলার মসনদে। সময়টা ১২৯২-১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ। তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য সেনাপতি জাফর খান গাজীকে দক্ষিণবঙ্গে পাঠান সেইসমস্ত

আঞ্চলিক রাজার বিরুদ্ধে, যাঁরা তখনও হিন্দু রাজত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন। জাফরখান গাজী প্রথমে আক্রমণ করেন ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম। জাফর খানের আক্রমণে ত্রিবেণী বিধ্বস্ত হল। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষণসেনের তৈরি বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির, সূর্যমন্দির, হরগৌরীর মন্দির, গঙ্গামন্দির ধ্বংস করে তিনি মন্দির কমপ্লেক্সটি মসজিদে পরিণত করেন। ত্রিবেণীর মান রাজা পরাজিত হয়ে বাধ্য হন ধর্মান্তরিত হতে। তৎকালে সংগ্রাম ছিল বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও বাণিজ্য নগর। সেটিকে কব্জায় আনতে যুদ্ধ চললো। কিন্তু ভূদেব নৃপতির বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে সপ্তগ্রাম অঞ্চলকে বাগে আনতে বেগ পেতে লাগলেন জাফর খান গাজী। জাফর খান গাজীর একাধিক পুত্র ছিল। তার তিন পুত্র সমকালের বিখ্যাত বীর। এঁরা হলেন আইন খান, ঘাইন খান এবং বড়খাঁ গাজী। জাফর খান গাজী ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তার তৃতীয় পুত্র বড়খাঁ গাজীকে নিম্নবঙ্গে ইসলামীকরণের জন্য পাঠান। জাফর খান গাজীর এই তৃতীয় পুত্র বড়খাঁ গাজীই আমাদের আলোচ্য দক্ষিণরায়, মুকুটরায়, চম্পাবতী কাহিনি বিজড়িত বড়খাঁ গাজী। বড়খাঁ গাজীর সুন্দরবন অভিযানের মধ্যেই ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়ে যায় জাফর খান নামাঙ্কিত মসজিদটি। সপ্তগ্রাম তখন মুসলিম শাসকের দ্বারা অধ্যুষিত। ঠিক সেই সময় সপ্তগ্রামের ভূতপূর্ব রাজা ভূদেব নৃপতির অতর্কিত আক্রমণে মহানাদের কাছে তুমুল যুদ্ধে জাফর খান গাজী প্রাণ হারান। তার মুন্ড পড়ে থাকে মহানাদে। তাঁর দেহ তুলে নিয়ে এসে ত্রিবেণীর রূপান্তরিত মসজিদে সমাধি দেওয়া হয়। জাফর খানের পুত্র বড়খাঁ গাজী বাধ্য হন তড়িঘড়ি খনিয়া যুদ্ধ শেষ করে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সন্ধি করে ত্রিবেণীতে ফিরে আসতে। তিনি ভূদেব নৃপতিকে পরাজিত করে ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বড়খাঁ গাজীর দক্ষিণরায়ের সঙ্গে খনিয়া সন্ধির এটাই ঐতিহাসিক কারণ। ঘটনাটি ঘটে ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কবি কৃষ্ণরামদাস তার রায়মঙ্গলে লিখেছেনঃ 'বড়খাঁ গাজীর সাথে/মহাযুদ্ধ খনিয়াতে/ দোস্তানি হইল তার পর।

জাফর খান গাজীর ত্রিবেণী আসার পর ত্রিবেণীর পবিত্র পরিবেশ এবং হিন্দু সাহচর্যে তিনি এবং তার পরিবার গঙ্গার বড় ভক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি গঙ্গার উদ্দেশ্যে একটি স্তবও লিখেছিলেন ?

সুরধুণি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সাতরতি নিজ পুণ্যে স্তত্র কিস্তে মহত্ত্ব।
যদিচ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বম মহত্ত্বম।

বহু মুসলমান কবিও জাফর খানের এই গঙ্গাভক্তির কথা তাঁদের কাব্যে লিখে গেছেন ঃ

জাফর খাঁ গাজী বহিল ত্রিবেণীর স্থানে।
গঙ্গা যাবে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।।

-- মহিউদ্দিন ওস্তাগর

স্মর্তব্য যে, রায়মঙ্গলের প্রাচীনতর কবি মাধব আচার্য্যের নিবাস ছিল ত্রিবেণীর

কাছাকাছি অংশে।তাঁর কাব্যে ত্রিবেণীর উজ্জ্বল বর্ণনা রয়েছে। অনুমান করি, মাধব আচার্য এই গোলযোগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে চট্টগ্রামে চলে গিয়েছিলেন। যাইগোক, বড়খাঁ গাজী উত্তরাধিকারী সূত্রে অর্থাৎ তার পিতার কাছ থেকেই তার গঙ্গাভক্তির সংস্কার পেয়েছিলেন আর তার সাথে যুক্ত হয়েছিল সাধ্বী চম্পাবতীর ভক্তি। শেষ জীবনে বড়খাঁ গাজী সুন্দরবন অঞ্চলের অবহেলিত, বর্ণহিন্দুদের দ্বারা ঘৃণিত ও জনগণের ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন। সুন্দরবনের নদী তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছিল দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর সৌহার্দমূলক ধর্মকেন্দ্র। বড়খাঁ গাজীর মৃত্যুর পর তার পিতার মসজিদে তাকে সমাহিত করা হয়। সেখানে জাফর গাজী সহ তার দুই দাদা, তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্রের সমাধি রয়েছে। বড়খাঁ গাজীর স্মৃতিতে সুন্দরবন সহ বাংলার নানা স্থানে তাঁর সমাধি মন্দির ও মাজার স্থাপিত হয়। বিজয়নগরের নিকটবর্তী চন্ডীপুর গ্রামে বড়খাঁ গাজীর একটি সুপ্রাচীন সমাধি মন্দির রয়েছে। মৃত্যুর পর বড়খাঁ গাজী সমাহিত হয়েছেন বটে কিন্তু এখনও সুন্দরবনের গ্রাম্যমেলায়, মাঝি মাল্লাদের গানে, সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে তিনি সজীব।

হইআ বান্দার বান্দা নুঙাইয়া শির।
বলিব বড়খাঁ গাজী পীর দস্তগীর

সংগ্রহণ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ঃ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আগ্রহ সুবিদিত। যেখানে যখনই সুযোগ পেয়েছেন তিনি, আবেদন রেখেছেন মাতৃভাষাকে বিজ্ঞানচর্চার বাহন করার। রিপণ কলেজের অধ্যাপক এবং বাংলায় রচনার অন্যতম পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন তাঁর প্রেরণা। নিজের উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে প্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ২৫ জানুয়ারী শুভারম্ভ। সে সময়ের সব বাঙালী বিজ্ঞানী তাঁর সাথী হননি। কিন্তু দারুণ সমর্থন জুগিয়েছিলেন সহপাঠী নিখিলরঞ্জন সেন। এছাড়াও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্যামাদাশ চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যরতন চক্রবর্তী প্রমুখ সহযোগী হয়েছিলেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা পরিষদের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রফুল্ল কুমার মিত্র ছিলেন প্রথম সম্পাদক। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবস্তু থেকে শুরু করে লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের বই সহজ বাংলায় প্রকাশ করা ছিল এই পরিষদের লক্ষ্য। এছাড়াও প্রদর্শনী ও বক্তৃতাও ছিল পরিষদের আয়োজনের মধ্যে। নামীদামী বিজ্ঞানীরা অংশ নিতেন পরিষদের কর্মযজ্ঞে। একদিকে রাজশেখর বসু বলছেন বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে, অন্যদিকে দেবেন্দ্রমোহন বসু আলোচনা করছেন পরিষদের আদর্শ নিয়ে। সে এক স্বর্ণযুগ।

বলাবাহুল্য, এই সময়ের উৎকর্ষকে পরবর্তীকালে সেভাবে ধরে রাখতে পারেনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। মেধার জায়গা নিয়মতান্ত্রিকতা দখল করায় পরিষদ হারিয়েছে তার গুরুত্ব।

কিছু ছড়া : চেহারা ও ঐতিহাসিক পটভূমি

ড. বলাইচাঁদ হালদার

বর্তমান কালে অসংখ্য ছড়াকার অসংখ্য ছড়া লিখে চলেছে ক্লান্তিহীন ভাবে। সব ছড়ার আকৃতি ও প্রকৃতি একরকম নয়। একরকম হয় না; হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারও কাছে প্রকৃতি, কারও কাছে বিজ্ঞান ও কারো কাছে ভাষা, কারও কাছে মনীষী। কারও কাছে ভূতপ্রেত, কারো কাছে মানুষের জায়গা; কারো কাছে ভাষা; কারো কাছে রাজনীতি। এমনতর অসংখ্য বিষয় নিয়ে ছোট এবং বড়দের জন্য কবিরা তাঁদের ছড়ার ডালি সাজাচ্ছেন।

কিন্তু কিছু ছড়ার পেছনে ইতিহাস কেমনভাবে খাঁপটি মেরে চুপটি করে থাকে সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ বর্তমান নিবন্ধের বিষয়।

সারা পৃথিবীতে প্রচলিত Nursery Rhymes গুলোর দু'একটি নিয়ে, আলোচনা করলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

শ্রীমতী Linda Alchin 'The Secret History of Nursery Rhymes' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি লিখে আমাদের নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন বা নবদৃষ্টি দিয়েছেন।

ধরা যাক Jack and Jill এই ছড়াটি। সকলের চেনাজানা।

Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water
Jack fell down and broke his crown
And Jill came tumbling after.

ছোটরা অর্থ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। হেলতে দুলতে সুর করে ছন্দ মিলিয়ে পড়বে বা আবৃত্তি করতে তাদের দারুণ মজা। বড়রা অবশ্য সবসময় অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়।

সাধারণভাবে ভারতীয় মন ছড়াটি পড়ে অর্থ উদ্ধার করে Jack & Jill বালতি ভরে জল আনতে গেল এবং মাথা ফাটাল; আর জিল ডিগবাজি খেয়ে তার পরে ঘরে ফিরল।

শুধু ভারতীয়রা কেন সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা বোধ হয় মোটামুটি ঐ ধরনের অর্থ করে।

শ্রীমতী Linda Alchin জানাচ্ছেন – এই ছড়াটির উৎপত্তি ফ্রান্সে। ফরাসি দেশে ১৭৯৩ সালে Reign of terror' ঘটে। ছড়ার Jack আসলে রাজা ষোড়শ লুই (King Louis XVI) যাঁর মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল Who was beheaded (lost his crown) আর Jill হলেন Queen Marie Antoinette (who came tumbling after)। পরে Jack and Jill বলতে একটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে বোঝায়। Linda আরো জানিয়েছেন শেক্সপীয়রের 'A Midsummer Night's Dream এবং Love's Labour's Lost নাটকে Jack এবং Jill গ্রহণ করা হয়েছে।

যথাক্রমে উদাহরণ "Jack shall have Jill; Nought shall go ill" "our wooing doth not end like an old play; Jack hath not Jill" কখনো কখনো Jill বানান লেখা হয় Gill। ছড়ায় যেটা হামেশাই হয়ে থাকে।

Linda Alchin এর দেওয়া তথ্যগুলি আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। নেওয়া যাক আর একটি পরিচিত Rhyme Little Miss Muffet.

Little Miss Muffet sat on a tuffet
Eating her curds and whey
Along came a spider,
Who sat down beside her
And frightened Miss Muffect away!

আমরা অর্থ করি – কুমারী Muffet মোড়ার ওপর বসে দই আর ঘোল খাচ্ছিল্ হঠাৎ একটা মাকড়সা এসে পড়ায় সে এমন ভয় পেল যে ছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু Linda জানাচ্ছেন এক মতানুসারে Little Miss Muffet একটি ছোট্ট মেয়ে যার প্রকৃত নাম Patience Muffet। তার বিপিতা (Step father) Dr. Muffet ছিলেন একজন পতঙ্গ বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণাগারের কোন মাকড়সা (Spider) ছোট্ট মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় মতানুসারে Little Miss Muffet হলেন গোঁড়া ক্যাথলিক Mary, Queen of Scots (1543 - 1587) এবং স্কটিশ ধর্ম সংস্কারক John Knox (1510-1572) হল সেই মাকড়সা যাঁকে দেখে রানী Mary রীতিমত ভীত ছিলেন। রাণী Mary সংস্কারক John Knox এর ভয়ে স্কটল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। রাণীর মন্তব্য "I'll fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe".

শ্রীমতী Linda -র দেওয়া তথ্যগুলি জেনে আমরা একই সঙ্গে আনন্দিত ও বিস্মিত হই।

অনুরূপভাবে বাংলায় প্রচলিত ও লিখিত ছড়ার ঐতিহাসিক পটভূমি জানলে আমরা ও হয়তো অফুরন্ত আনন্দ পেতে পারি।

খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কীসে?

এই ছড়াটিকে অনেকে ঘুমপাড়ানি ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এর পেছনের ইতিহাস তো বর্গী আক্রমণ কাল আলবর্দি খাঁ এবং ভাস্কর পণ্ডিতের সময়ের (১৭৪২ খ্রী.) কথা মনে করিয়ে দেয়।

তবে –

খুখা গুম্ হাইলো ফারা ৎস্ উরাইলো
গরখী আইলো ধ্যাশে।

রূপান্তরিত এই ছড়ায় 'বর্গী' 'গরখী' রূপ নিয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'গরখী' শব্দের অর্থ সামুদ্রিক ঝড়। আর এই সামুদ্রিক ঝড়ের বীভৎসতার ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো হলে ইতিহাস আরো পিছিয়ে যাবে। কারণ, এই সামুদ্রিক ঝড়ের বয়স মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ কালের চেয়ে অনেক বেশি।

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

উপরের ছড়াটি স্বনামধন্য অন্নদা শংকর রায়ের বহু প্রচলিত ছড়া। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ না করে হেলেদুলে মনের আনন্দে পড়তে পারে, গান করতে পারে। কিন্তু এর পেছনে তো আছে ভারত ভাগের নির্মম সত্য। অখণ্ড ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান আলাদা দুটি রাষ্ট্র হল। এবং 'বুড়ো খোকা' কারা? সপার্ষদ মহাত্মা গান্ধীও সপার্ষদ মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ নয় কি ?

একালের সুরচিত অনেক ছড়ার পশ্চাৎপটে হয়তো নানা ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য লুকিয়ে আছে। সেগুলি জানলে সচেতন পাঠকের বাড়তি লাভ ও বাড়তি আনন্দ হয়।

তাই বর্তমান নিবন্ধকারের আশা– একালের একনিষ্ঠ ও গবেষক পাঠকরা হয়তো বাংলা ছড়ার ঐতিহাসিক পটভূমি জানিয়ে ও বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করবেন।

পরলোকে ড. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট ক্ষেত্রগবেষক পুরাতাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক ইতিহাসকার ড. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৯ মে তাঁর গরফা, যাদবপুর বাসভবনে পরলোক গমন করেন। ১০ মার্চ ১৯৩৩ সালে ঢাকার ধানমাণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস, লণ্ডনে ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। কালিদাস দত্তের অনুপ্রেরণায় ২৪ পরগনায় পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর গবেষণা করেছেন জীবনভর। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি হল 'আদিগঙ্গা প্রত্নপরিক্রমা', 'সুন্দরবনের মণি অববাহিকা', ইংরাজী 'সুন্দরবন রেঞ্জেস'। 'রামপ্রসাদী জগর্দামী রামায়ণ' সম্পাদনা করেছেন। তিনি বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ব পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে গরফায় পুরাতাত্ত্বিক মিউজিয়াম তৈরি করেছিলেন। এই মিউজিয়াম পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন।

পুতুলনাচে যন্ত্র প্রযুক্তি

অমৃতলাল পাড়ুই

বর্তমানে পুতুলনাচ বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তার সঙ্গে খৃষ্টপূর্বে দ্বিতীয় শতাব্দীর বর্ণিত পুতুলের কোন মিল নেই। এই ধরনের পুতুলনাচ শিল্পের উদ্ভব মোটামুটি দেড়শ বছর আগে। এই ঐতিহ্যবাহী অথবা আরও পরে উদ্ভূত প্রচলিত বাংলার পুতুলনাচ চারটি ভাগে দেখা যায়। ১) ম্যারিওনেট বা স্ট্রিং পাপেটের বাংলায় জনপ্রিয় নাম তারের পুতুল নাচ। (২) রড প্যাপেট বা সঙ পুতুল নাচ (৩) গ্লাভস বা হ্যাণ্ডি পাপেটের আটপৌরে নাম বেণীপুতুল নাচ, (৪) স্যাডো পাপেটকে বলে ছায়াপুতুল নাচ।

শিল্প বিপ্লবের ফলে ধীরে ধীরে যখন যন্ত্রানুসঙ্গ সমাজে সভ্যতার নতুন আলো দেখাচ্ছে অনেক ঐতিহ্যবাহী শিল্পীদের ওপর বিভিন্ন দিকে নতুন ভাবনায় প্রভাব ফেলছে। প্রভাবিত হওয়া নির্ভর করে শিল্পীদের শিল্প বৈচিত্র বোধ শিক্ষার ওপর, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, শিল্প প্রয়োগের নিরাপত্তার ওপর, সমাজ অর্থনীতির ওপর। তাই পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী পুতুলনাচের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারল না।

১৮৭৩-৭৫ সালে মন্দিরবাজার থানার বাঙ্গাবেড়িয়া গ্রামের উদ্ভব ব্যাপারী খড়ের পুতুলে কাপড় কেটে সুঁচ - সুতো দিয়ে সেলাই করা পোষাক পরিয়ে পুতুল নাচ দেখাতেন। পরে বিভিন্ন দলের পুতুল সজ্জাকরগণ আধুনিক পোষাক তৈরির যন্ত্রাদি ব্যবহার করে পুতুলের চরিত্রানুযায়ী পোষাক তৈরি করে পুতুল নাটকের দৃশ্যাদির ওপর খুব নজর দিয়ে থাকেন। কালীকৃষ্ণ হালদারের ১নং টকি পুতুলনাচের ভূষণচন্দ্র হালদারের পুতুল সজ্জাকর পরিচালক হিসাবে ৮২বছর বয়সেও সুনাম ছিল। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটকের জন্য কলকাতার চিৎপুর থেকে নতুন যন্ত্রে তৈরি চরিত্রানুযায়ী পোষাক সংগ্রহ করতেন দল মালিকগণ। সংগীত ক্ষেত্রে বহু নতুন নতুন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পুতুল নাচে সাধারণ হারমোনিয়াম, ক্ল্যারিউনেট অথবা কর্ণেট আর তবলা ঢোলক ছাড়া কোন যন্ত্রাদি প্রভাব ফেলতে পারেনি। আজও এজন্য কোন চিন্তা ভাবনা নেই মূলতঃ অর্থ আমদানি না হওয়ার কারণে। শ্রী শ্রী মাকালী পুতুলনাচ পার্টির সুরকার ও গায়ক শিল্পীজীবনের পঞ্চাশ বছরেও মনে করেন যে, এতেই পুতুলনাচের গানে মাৎ করে দেওয়া যায়।

কাঠের পুতুল তৈরিতে দেবেন্দ্র সরলা পুতুলনাচের গোবিন্দ চন্দ্র নস্করের মত শুধু হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে পুতুল তৈরিতে চমক দেখান। তাহলেও শ্রীশ্রী কালীমাতা পুতুলনাচ পার্টির পুতুল নির্মাতা পরিচালক প্রফুল্ল কর্মকার আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পুতুল তৈরিতে চরিত্রানুযায়ী নতুন ভাবের সঞ্চার করেন। অথবা ধীরেন নাট্য তারের পুতুল নাচ পার্টির কৃত্তিবাস হালদার পুতুল নির্মাণ বা পটশিল্পে যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতিতে প্রভাবিত। সত্যনারায়ণ পুতুলনাট্য সংস্থার নিরাপদ মণ্ডল পুতুল নির্মাণে অত্যাধুনিক যন্ত্রাদি সহযোগে পুতুলের হাত-পা-মাথার নড়াচড়া ও চোখের চাহনি আর মুখের ভঙ্গিমার জন্য উন্নততর ব্যবস্থা নিয়ে

থাকেন। এ ব্যাপারে কলকাতার থিয়েটার আঙ্গিকের মঞ্চ কলাকৌশল ও পুতুল নির্মাণে অগ্রণী সুরেশ দত্তের পুতুল নাচ দলে নিরাপদ যোগাযোগ বড় ভূমিকা নেয়। সুরেশ দত্তের 'আলাদিন' ও 'লক্ষণের শক্তিশেল' মঞ্চ পুতুল নাট্যের আঙ্গিক সম্পূর্ণ যন্ত্রসভ্যতা প্রভাবিত। রঘুনাথ গোস্বামীর ছায়াপুতুল ও মঞ্চ আঙ্গিকে আনুষাঙ্গিক সকল যন্ত্র কৌশলে ব্যবহৃত। মঞ্চ পুতুল বা ছায়াপুতুল আলো নিক্ষেপণ কৌশলে সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছে। শুভ যোয়াদ্দারের বেণীপুতুল মঞ্চ নির্ভর সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রাদি আরোপিত। যন্ত্রাদি আরোপিত। কিন্তু অন্যান্য বেণীপুতুলের দলগুলি এখনও যন্ত্র সভ্যতার প্রভাব এড়িয়েই খোলা জায়গায় পুতুল নাচের গান গেয়ে যায়।

উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে ধীরে ধীরে ডাঙ পুতুল ও তাদের পুতুল নাচ দলে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে থাকায় একটু একটু করে মাইক্রোফোন সহযোগে সমগ্র গান অভিনয় চলতে লাগল। এর ফলে এক দশকের মধ্যে সুক্ষ্ম অভিনয় রীতি পুতুল নাচে এসে গেল। আশির দশকে মঞ্চকেন্দ্রিক শহুরে পুতুলনাচের দলগুলি অভিনয় ও গান রেকর্ড করে রাখতে লাগল। মঞ্চে রেকর্ড অনুযায়ী পুতুলগুলি অভিনয়ের রূপ দেখাতে লাগল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও আলোচনায় হীরেন ভট্টাচার্য ও রত্না ভট্টাচার্যের দল গ্রামের এদিক ওদিক বায়না নেওয়া দলগুলিকে বোঝাতে চাইল যে, এরূপ করলে দল পরিচালনায় বেশ নিরাপদে থাকা যায়। কিন্তু এদিক ওদিক খোলা জায়গায় বায়না নেওয়া দলগুলির মালিক বুঝতে পারলেন যে এতে আরও আপদ বেশি। তাছাড়া শিল্পীদের প্রত্যক্ষ শিল্পপ্রদর্শনের কোন কদর থাকছে না। তবুও যদুনাথ হারদার পুতুলনাচ সংস্থার জগদীশচন্দ্র হালদার এরূপ পালা রেকর্ড করে পুতুল নিয়ে রাশিয়ায় উৎসবে গিয়েছিলেন পুতুলনাচের পালা দেখাতে।

মঞ্চ নির্ভর দলগুলি ছাড়া গ্রামের পুতুলনাচের দলগুলি আলোক প্রক্ষেপণ যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ দলগুলির অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। তবু আশা তো থাকে। পেট্রোম্যাক্স বাদ দিয়ে জেনারেটর দ্বারা বাল্ব লাগিয়ে পুতুলনাচের আসরে বিদ্যুতের আলো পড়ল। মাঝে মাঝে পুতুলকে নাচাবার সময় রঙীন কাগজ দ্বারা বিভিন্ন রঙের ছায়া ফেলতে থাকে। দর্শক থেকে কোথাও কণ্ঠস্বর ভেসে আসে- কী আলোর ক্যাপাসিটি। পুতুলনাচের মাচার শেষ দিকে পর্দায় শুধু সাদা বিদ্যুতের আলো পড়ে থাকে অভিনয়ের সময়। এইভাবে দেখা যায় শহুরে সঞ্চনির্ভর পুতুলনাচ ছাড়া গ্রামগঞ্জে গাওনার দলগুলির মালিক আধুনিক যন্ত্রপাতির সর্বপ্রকার সহায়তা নিতে সক্ষম হচ্ছেন না।

সংগ্রহন

বাংলার উৎসব ঃ অক্ষয়তৃতীয়া, ইষ্টার, ইদ-উল-জোহা, ইদ-উল-ফিতর, কলকাতা বইমেলা, কালীপূজা, কেঁদুলি বা জয়দেবের মেলা, ক্রিসমাস, গঙ্গাসাগর মেলা, গুরুনানকের জন্মদিন, গুরুপূর্ণিমা, চড়ক মেলা, চীনা নববর্ষ, চোদ্দো প্রদীপ, জগদ্ধাত্রী পূজা, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, জলপেশ্বর মেলা, জামাইষষ্ঠী, ঝাঁপান, ঝুলনযাত্রা, দশহরা, দীপাবলি, দুর্গাপূজা, দোল, ধনতেরাস, নজরুল জয়ন্তী, নববর্ষ, নবান্ন, পঁচিশে বৈশাখ, পৌষমেলা, পৌষ পার্বণ, ফলহারিণী কালীপূজা, বাসন্তী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, বিষ্ণুপুর উৎসব, বুদ্ধপূর্ণিমা, বেড়া উৎসব, ভাইফোঁটা, মহরম, মহাবীর জয়ন্তী, মিলাদ-উন-নবি, রটন্তী কালীপূজা, রথযাত্রা, রাখি, রান্নাপূজা, রাসমেলা, লক্ষ্মী পূজা, শবেবরাত, শিবরাত্রি, সরস্বতী পূজা, সাবিত্রী চতুর্দশী।

আশির কবিতা ঃ প্রতিবাদ যখন কবিতা

রাণা চট্টোপাধ্যায়

বহুচর্চিত 'প্রতিবাদ' শব্দটির বদল হওয়া একান্ত জরুরী। ইংরাজী শব্দ 'প্রটেস্ট' শব্দটির আভিধানিক বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রতিবাদ'। 'অ্যাজিটেশান' বিক্ষোভ। কিন্তু 'প্রতিবাদ' শব্দটি যখন কবিতায় ব্যবহৃত হয়, তখন তার চিত্রকল্পই পাল্টে যায়। সে সময় মনে হয় কবিতাই বুঝি বিপ্লব এনে দিচ্ছে। বাংলা কবিতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ দেখিয়েছে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য কবি। সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে, কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে, শাসকের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠেছে শব্দ। অমোঘ হয়েছে বাক্য। কবিদের এই জেহাদ একসময় শাসকের সিংহাসনকেও টলিয়ে দিয়েছে। কু-প্রথা ধ্বংস করেছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মঙ্গলবাক্য ছুঁয়ে উনবিংশ -বিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা বহু আশ্চর্য পঙক্তি পাই। যা নিছক নিসর্গ বর্ণনা বা প্রেম বিষয়ক নয়। শুধুই ধিক্কার, বিক্ষোভ, ঘৃণা, শ্লেষ, বিদ্রুপ আর প্রতিবাদের। আমি নতুন কোন কথা বলছি না। এ-বিষয়ে অনেকেই গদ্য লিখেছেন। আমরা সে সব গদ্য পড়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছি বাংলা ভাষায় বেশির ভাগ কবিই নিছক সৌন্দর্য চর্চা করে কাল কাটিয়েছেন, এরকম দেখা যায় না। যখন নিছক রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে কবিতা লিখছেন কেউ, তখনও কায়দা করে সামাজিক কোন ব্যাধির বিরুদ্ধে কবি সোচ্চার হয়েছেন। প্রতীকের সাহায্যে ইঙ্গিতের ব্যবহারে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অজস্র উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু, আমি তো প্রতিবাদী কাব্য ইতিহাস লিখতে বসিনি। আমি বর্তমান সময়ের তরুণতম কবিদের রচনায়ও এই অনুষঙ্গ পাচ্ছি কিনা। সন্ধান করছিলাম। তবে, কথায় আছে ভাত খাওযার আগে, পাতা পাততে হয়। নুন, জল, লেবু দিতে হয়। নইলে খাওয়াটাই হয় না। মাটিতে ভাত খাওয়া হয়তো চোরের ওপর রাগ করে চলে। কিন্তু সেটা কোন কাজের কাজ নয়। তাই, বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কবিতা আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই পুরানো ইতিহাস সামান্য ঝালিয়ে নিতেই হয়। এ যেন সেতারের আলাপ। তারপর বাজনা! তাই, যা বলছিলাম পূর্বেও অনেক কবিকে প্রেম বিষয়ক বা জীবনী বিষয়ক কাব্যেও সুচতুর উপায়ে কবির প্রগতিশীল কিংবা প্রথাগত মানসিকতার উপাদান প্রবেশ করিয়ে দিতে দেখি। কিছুদিন আগে প্রায় পাঁচশো বছরের পুরানো শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' পড়তে পড়তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। চৈতন্যভক্ত দামোদর দেখছেন মহাপ্রভু জনৈকা বারঙ্গনা'র পুত্রকে ডেকে স্নেহ করেছেন। সমাজের চোখে বারাঙ্গনা চ্যুত। এটা চৈতন্য ঠিক করছেন না দামোদরের মনে হলো। দামোদরের মনে হলো, না স্বয়ং চরিতামৃত রচয়িতা'র মনে হয়েছিল কে জানে? কারণ, এতো ডায়েরি লেখা নয়। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর বহু বছর পর লেখা। তাই শূচিবায়ুগ্রস্থ গ্রন্থাকর নিজের কথাই লিখেছেন বা প্রতিবাদ করেছেন–

"পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।

রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর।
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তদ্যাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী।
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকে কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥"

(চৈ, চরিতামৃত/ অন্ত্যলীলা)

একটি উদাহরণই যথেষ্ট। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গোবিন্দচন্দ্র দাস কিংবা পরবর্তী সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রতিবাদী কবি। দু'জন দু'রকম ভাবে সোচ্চার হয়েছেন।

"কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট"– শুনে দেশবাসী পুলকিত হলেও, শাসকের পক্ষে সুখকর শ্রাব্যকাব্য নয়। কারণ, জনগণকে কবি জেলের মুক্তিবাদী বীর কয়েদীদের গারদ ভেঙে বের করে আনতে বলছেন। কিংবা "দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান/ কন্টক মুকুটে শোভা"-র ব্যঙ্গ বহুদূর প্রসারিত। পরবর্তী সময়ে আমরা চল্লিশের অনেক কবিকেই প্রতিবাদ করতে দেখেছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, রাম বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে মানুষের সপক্ষে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কবিতা লিখতে দেখি।

"এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে"" লিখে দিনেশ দাস রীতিমত অবহেলিত তৃণমূলের কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। পরবর্তী সময়ে শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, পূর্ণেন্দু পাত্রী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবধি অনেকেই প্রতিবাদী কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছেন। এমন কি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত'র মতোন শুদ্ধ কবিকেও প্রতিবাদে মুখর হতে হয় এমনই ভাবে –

"ভীষণ লজ্জা লেগেছিল যখন দেখেছিলাম
লেনিনের মুখ ইতিহাসের আবর্জনা ক'রে
ফাস্টফুডের মহোৎসবে তাসখণ্ডের মাস্তানেরা মোতে"

(লেনিনের মুখ/ জিগীষা জানু' ৯৭)

ষাট-সত্তরে অকেনেই প্রতিবাদী কবিতা লিখেছেন। শুদ্ধ কবিতা'র সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভের কথাও বলতে দেখেছি –

পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, অনন্ত দাশ, দীপেন রায়, কবিরুল ইসলাম, অঞ্জন কর, সমীর রায়, কমলেশ সেন, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দত্ত, মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ রাহা, জিয়াদ আলি, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, শুভ বসু, নীরদ রায়, নারায়ণ ঘোষ, কার্তিক মোদক, সুব্রত রুদ্র, গৌরশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, সুশীল পাঁজা, নমিতা চৌধুরী, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, ধূর্জটি চন্দ, শম্ভু বসু, বিশ্বনাথ ঘোষ, অলোককুমার ঘোষ, ব্রজ চট্টোপাধ্যায় অবধি অসংখ্য কবি। আশি-নব্বই দশকের তরুণতর কবিরাও স্বকীয় ভাবনায় প্রতিবাদী চরিত্র বজায় রেখে নতুন আঙ্গিকে নতুন দিকের প্রতিবাদী কবিতা রচনা

করে যাচ্ছেন। বস্তুত, আশি দশক-এ প্রায় শতাধিক কবিকে লিখতে দেখছি। বেশ কিছু নাম অনিবার্যভাবেই উঠে এসেছে। কেউ প্রকৃতির কথা বলছেন, কেউ নারী শরীরের বর্ণনা দিয়ে যৌন গন্ধী কবিতা লিখছেন। কেউ প্রেম-ভালবাসা'র পাশাপাশি স্বদেশ বিষয়ক কবিতা লিখছেন। কেউ আর্থসামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ডামাডোল, নেতাদের দুর্নীতি, অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা, বোধের বিরুদ্ধে কলম ধরছেন। কেউ কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। তবে বেশির ভাগই বিকৃতিধর্মী, কনফেশানাল, অকাব্যিক মনে হয়। প্রতিবাদ যখন আর প্রতিবাদ থাকে না শুধু মাত্র কবিতা হয়ে ওঠে তখনই পড়তে ভাল লাগে। আশি-তে এরকম কবিতা বড় জোর দশ-পনেরো জন লিখতে পারছেন। সব নাম করা অসম্ভব। আমার ভাললাগা কয়েকজন উল্লেখযোগ্য তরুণ কবির নাম আমি বলতে পারি – যেমন অলোক বিশ্বাস, শুভঙ্কর দাশ, বৃন্দাবন দাস, প্রণব পাল, ধীমান চক্রবর্তী, কাজল চক্রবর্তী, সৈয়দ হাসমত জালাল, শান্তনু প্রামাণিক, অদীপ ঘোষ, নরেশ দাস, পলাশ ভট্টাচার্য, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ চক্রবর্তী, জহর সেনমজুমদার, দেবাশিস প্রধান, সন্তোষকুমার মাজী, রবীন্দ্রনাথ পাল, শুভব্রত চক্রবর্তী, সৌমিত বসু, নাসের হোসেন, ঋজুরেখ চক্রবর্তী ও তরুণ গোস্বামী।

তবে সকলের উদ্ধৃতি দেব না। কারণ, প্রায় একই রকমের উচ্চারণ অনেকেরই। বোঝা যায়। আশি-তে এই সমস্ত তরুণ কবিরা প্রতিবাদের ভাষাও বদলে ফেলেছন। অনেকেই ইঙ্গিতের মাধ্যমে, অস্পস্টতর ভেতর দিয়ে, দুর্বোধ্য শব্দ চয়নের ভেতর কবিতাকে কাব্যিক সুষমায় ভরপুর করে তুলেছেন। কবিতা নিয়তই পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। এখন নিশ্চয় আশির কোন কবির লিখবেন না – "প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।" গোছের কবিতা বরং তারা লিখছেন – "ধুলো পায়ে এগুচ্ছে সকাল।/ জ্যোৎস্নার রাত বড় কাঙাল/ দুর্জয় পানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে যায়/ যাবতীয় জঞ্জাল" (রাক্ষস/বৃন্দাবন দাস) কিংবা ক্রমে ক্রমে দেখি স্বপ্নের সব পোড়ে ছাদগুলি/ হয়ে ওঠে ফাঁকা, উঠে আসে কিছু যুবক-যুবতী/ আশির দশকে। চোখের গভীরে না ফোটা হাজার/ ফুলের পিপাসা (কাজল চক্রবর্তী) কিংবা – রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটি / রোজ গান করে, সে বললো/ নিচে এখনও বিশ্বাসের জানালাটি খোলেনি। (পলাশ ভট্টাচার্য) কবিতায় দ্রোহ, বিপ্লব বা বিক্ষোভের কথা এরা কেউ সরাসরি বলেননি, কাব্যিকভাবে সুষমামণ্ডিত করে বলেছেন। আশি দশকের নতুন কবিরা আগের মতন সরাসরি বলতে অভ্যস্ত নন। দু'এক জনের কবিতা'র লাইন তুলে দেখানো যায়, কী ভাবছেন তাঁরা –

১) রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট
রাজা নেই, নষ্ট হবারও
ভয় নেই (ভয়/ বৃন্দাবন দাস)

২) মহাকাশ টুঁড়ে এই স্বপ্নাগার। তার না স্রোতে একতায় বেজে ওঠে অন্য পৃথিবী / অন্যনাম অন্য ঠিকানা। গাছও মানুষের যুথাচার, একান্নবর্তী/ ভূগোলের কোরাস (মহাকোরাস/ প্রণব পাল)

৩)　　তছনছ করে দিচ্ছে ত্রিশ বছরের স্মৃতি, স্বাধিকারবোধ/ তছনছ করে দিচ্ছে কৌতুহলের বিন্দু বিসর্গ/ তছনছ করে দিচ্ছে রক্তের সমূহক্ষ। (সন্তোষ কুমার মাজী)

৪)　　দশটা শালিক পাঁচ ছ-টা ময়না/ বল্লে ছি, ছি আর তো এসব সয়না/ কোকিল যদি গান শোনবে/ পয়সা অত তার কে খাবে ? (রামকিশোর ভট্টাচায্য)

৫)　　তরুণ বন্ধুর কোনো পথ নেই, শুধু এক মোমবাতির মিথ (জহর সেনমজুমদার)

আমি অনেক তরুণ কবির কবিতার উদ্ধৃতি দিতে পারি। কিন্তু সে সব কবিতায় প্রতিবাদের ভাষাই বদলে গেছে। অন্য রকম লাগছে, তাই দিয়েছি অন্য কিছু নয়। আরো কয়েকজনের লাইন তুলছি যেগুলি ভাষাও অভিনব সম্পূর্ণ আলাদা। আপাত দৃষ্টিতে খুব সহজ সরল কবিতা মনে হলেও প্রতিবাদ বা ক্ষোভ রয়েছে –

১)　　আরশোলাদের কাঞ্চন তরঙ্গধূন ফেঁসে যাচ্ছে। মোহনায় ফ্লেমকোষ ধুতে গিয়ে/ যদিও জানা হলো গ্রামগুলো কার্বননসিয়ায় বিপুল মেখেছিল। (অলোক বিশ্বাস)।

২)　　শুকতারা শুনতে শুনতে চোরকাঁটা জড়িয়েছে / অনেক চেষ্টা করে পারলে না ছাড়াতে / হয়তো আলো কাঁটার খেলা এ ভাবেই অনন্তকাল (রবীন্দ্রনাথ পাল)

৩)　　অভুক্ত মাংসের পাশে ঘুরছে প্রমত্ত বাঘ (সৈয়দ হাসমত জালাল)

৪)　　রঙ বাছতে বাছতে প্রিয় রঙ ভুলে যায় মানুষ/ মানুষ বাছতে বাছতে একদিন হারিয়ে যায় মনুষত্ব (নরেশ দাস)

৫)　　ওকে জড়িয়ে ধরবে দড়ি, হে অশ্বমেধের ঘোড়া/ তুমি ঘাস খাও মিথ্যে বলো, তোমার মালিকও কি ? (ধীমান চক্রবর্তী)

৬)　　চড়া রঙ, যে রঙ মুখোশের আড়ালে তুমি অন্য ভূমিকায় অভ্যস্থ / প্রদর্শনীর শেষে আজ আরও একবার নিঃশব্দে তুলে ফেলো রাত্রি গভীরের/ সাবলীল মেক্‌আপ শূন্যতার ভিতর (শুভব্রত চক্রবর্তী)

৭)　　আর কত মিনতির পরে/ মলিন জলরেখা ছুঁয়ে হে অতীত, স্বপ্নমগ্ন স্থবিরতা/ নির্জন অন্ধকারে আলোকিত হবে (শান্তনু প্রামাণিক)

আশির কবিরা এইভাবে লিখছেন। লিখছেন না 'বেয়নট হোক যত ধারালো/ কাস্তেটা শান দিও বন্ধু'র মতো প্রত্যক্ষ কোন প্রতিবাদী পঙতি।

আবহমান বাংলা কবিতার যে প্রতিবাদ অনুষঙ্গ, শব্দব্যবহার, ছন্দ অলংকার তা থেকে হয়তো বিচ্যুতি ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু বিষ্ণু দে থেকে শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত থেকে জিয়াদ আলি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় থেকে বৃন্দাবন দাস, পলাশ ভট্টাচার্য বা নরেশ দাসরা যে প্রতিবাদী চরিত্রটি বজায় রেখেছেন, বলাই বাহুল্য, এ সময়ে যারা কবিতাকে মালার্মে, রিতলকে বা লোরকার মেজাজ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন, তারাও বলতে দ্বিধা নেই, মাটির কাছাকাছি আছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে আছো মাটির কাছাকাছি/ তার লাগি কান পেতে আছি' সেই মাটির কাছাকাছি থাকা পশ্চিমবাংলার শহরে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা কবিরা অন্য সুর ও মেজাজেই কথা বলছেন এটুকু বলতে পারি।

হাতির পিঠে হাওদা

শ্রীজীব গোস্বামী

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
ছাদনা তলায় কে?
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে। ------ (প্রচলিত)

এইসব ছেলেভুলানো ছড়ায় এককালে যে ছবি কবির লেখনীতে উঠে এসে খোকা-খুকুদের প্রাণ-মন ভরিয়ে তুলত বাস্তবের আঙিনায় তার কিয়দংশও সেদিন সম্ভবপর ছিল না। আমরা অনেকেই সার্কাসের খেলায় ঘোড়ার নাচ সমবেতভাবে বা এককভাবে ব্যাণ্ডের তালে তালে নাচতে দেখেছি। দেখেছি হাতির বিবিধ খেলা।

হাতি ফুটবল খেলছে। হাতি ব্যাটবল খেলছে। সার্কাসের ময়দানে- চার মারছে ছক্কা হাঁকাচ্ছে। হাতি বিনীতভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে, নারকেল আছাড় মেরে ফাটিয়ে শিবপূজা করছে। কী অদ্ভুতভাবে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর কাছে শুঁড় বাঁকিয়ে নমস্কার করছে, প্রণামী দিলে যথাস্থানে রাখছে। এর থেকে অনুমান করা যায়- প্রশিক্ষণ দিলে হাতি কি না পারে।

মনে পড়ে উত্তর পূর্ব প্রদেশে হাতি চরানোর সেই বিখ্যাত গান- হস্তিরে চরান, হস্তিরে নরান/ হস্তির গলায় দড়ি/ ও মোর মাহুতবন্ধুদের আমাদের প্রাণমন ভরিয়ে দেয়। হাতির পিঠে চড়ে তারা মানে আসামের গোয়ালপাড়ার অঞ্চলে মানুষ একস্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করেন। হাতিকে দিয়ে গাড়িটানা, মালপরিবহন ও রেলগাড়ি শান্টিং করানো হয়। পরিবহনের অপ্রতুলতায় বড় বড় কাঠের গুঁড়ি হাতিদের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে হাতিকে প্রথম যুগে পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হত।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মরমী লেখনীতে গরুকে নিয়ে "মহেশ"র মত বিখ্যাত গল্প লেখা হলেও হাতিকে নিয়ে অতন অনবদ্য লেখা আছে কিনা জানা নেই। হাতিকে নিয়ে হাতির আয়তন বিস্তৃতির ভয়ালরূপের পাশাপাশি করুণরসের অনেক কাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে শোনা যায়। প্রিয় মাহুত দীর্ঘদিনের ছুটিতে বাড়ি গেলে সেই মাহুতের পরিবর্তে অস্থায়ী মাহুতের ভুল-ভাল আচরণে হাতি ক্ষিপ্ত হয়ে অস্থায়ী মাহুতকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মেরে পদতলে পিষ্ট করে মেরে ফেলেছে শোনা যায়। শুনেছি দীর্ঘদিনের সেবাযত্নে লালিতপালিত হাতি একদিন মাহুতের ক্রোধপ্রকাশে কাঁদছে। আবার অন্যায় আক্রমণে মাহুতের শত্রুকে নিধন করেছে সেই বিশ্বস্ত হাতি।

ছোটবেলায় পড়া শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারের দুই হাতির গল্প- যাত্রামঙ্গল ও কুসুমকলির কথা। তারা অদ্ভূত সুন্দর সামাজিক সহাবস্থানে যাবতীয় কাজকর্মের সাথে সংপৃক্ত হয়ে পাশবিক জগতের পশুত্বকে ঝেড়ে ফেলে অনেক বেশি মনুষ্যত্বের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

এছাড়া সভ্যতার প্রাথমিক যুগে হাতিকে মানুষ তার প্রয়োজনে পোষ মানিয়ে নানানকাজে ব্যবহার করত। আমরা জেনেছি পূর্বপুরুষ ম্যামথের বিলুপ্তির ইতিহাস এবং সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে আজকের এই হাতির রূপান্তর।

আজকাল মাঝেমধ্যেই সংবাদপত্রের পাতায় সংবাদ হিসাবে, কখনো টিভি-রেডিওতে হাতিদের নানান কীর্তিকলাপ শোনা যায়। কখনো গ্রাম-বাংলার পাড়ায় ঢুকে মাটির ঘরদোর ভাঙচুর করে শস্যভাণ্ডার লুঠ করে খেয়ে যায় সঞ্চিত শস্য। বাগান ক্ষেত খামার থেকে শাকসব্জি লুটপাট করে চালায় ধ্বংসলীলা। আবার অনেকসময় এক জঙ্গল থেকে অন্যজঙ্গলে পাড়ি দেয়। শোনা যায় দলমা পাহাড়ের কথা। এগুলো আসলে খাদ্যের প্রয়োজনে। খাদ্যাভাবের কারণেই ওরা জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসে।

দিনে দিনে পশুদের অধিকারে মানুষের হস্তক্ষেপে তাদের বাসভূমির আয়তন কমছে। কমে যাচ্ছে খাদ্যাখাদ্যের সংস্থান। তাই তারা সময়ে সময়ে লোকালয়ে হানা দেয়, লুঠপাট চালায় শস্যক্ষেতে ভাঙচুর করে শস্য ভাণ্ডার। ক্ষুধার জ্বালায় রোষের শিকার হয় অনেক সময় নিরীহ মানুষজন। ডাকপড়ে বনবিভাগের। অনেক সময় কুনকি হাতির সহায়তায় ওদের দলকে ফেরত পাঠানো হয়। কখনো আকস্মিক হামলা সামাল দিতে গ্রামবাসীরা মশাল জ্বেলে, ড্রাম বাজিয়ে উৎখাত করে। একেবারে লোকালয় থেকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে একরকম ঠেলে পাঠানো হয়। শোনা যায় হস্তিশাবকের মৃত্যুতে পথ অবরোধ কিংবা কোন হস্তির পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংবাদ। যার পরিণামে ওই মৃত হস্তিশাবক কিংবা মৃত হাতির প্রতিবাদে আকস্মিক ওরা রেলপথ বা মূলসড়ক অবরোধ করে দেয়। সংঘবদ্ধভাবে ওরা অবরোধে যোগ দেয়। এরকম ঘটনা ডুয়ার্স বা অসমে প্রায়শঃ ঘটতে শোনা যায়। পরিণাম নীরব প্রতিবাদ বা অবরোধ।

জঙ্গলের বুক চিরে রেলপথ বা সড়কপথ পারাবার করার সময় অচেতনভাবে ধাবমান ট্রেন বা ট্রাক-বাসের সংঘর্ষ হয়ে যায়। মৃত্যু ঘটলে বিপদ নেমে আসে। বুনো হস্তিবাহিনীর সামনে একমাত্র অসহায়তা প্রদর্শন ছাড়া কিছু করার থাকে না। বিভিন্নপ্রকারে অবরোধ তোলার ব্যবস্থা ছাড়া নানা পন্থা।

আবার কখনো কখনো সার্কাসের তাঁবু থেকে, কখনো জঙ্গল থেকে ও একক হস্তিনীকে চলে আসতে শোনা যায়। হস্তিবিশেষজ্ঞ ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর মতে ওগুলো আসলে প্রজননজনিত কারণে। উপযুক্ত সঙ্গির খোঁজে ওরা মত্ত হয়ে ওঠে। প্রজনন পর্ব সমাধা হলে আবার স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই হাতি পাওয়া যায়। তারমধ্যে এশিয়ার হাতিদের অন্যতম ঠিকানা ভারতবর্ষ। প্রায় ২৬০০০- ২৯০০০ এর মত বুনো হাতি আছে আমাদের দেশে। জঙ্গলভূমিতে প্রচুর হাতি থাকলেও এখনমাত্র ৮৬০০০ বর্গকিমি জঙ্গল এলাকা হাতিদের বিচরণস্থল। প্রতিবছর ৮০টি মত হাতি দুর্ঘনটায় প্রাণ হারায়।

বিভিন্ন খনিজ সম্পদ উত্তোলন, রেললাইন ও রাস্তা তৈরির প্রয়োজনে এদের থাকার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চীন, রাশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে

আফ্রিকার বিভিন্নদেশ ও ইউরোপে ক্রমে একইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংকুচিত হওয়ার পথে।

ভারতবর্ষেই ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে ৬৫৫টি হাতি প্রাণ হারিয়েছে তার মধ্যে ১২০টি হাতি বিয়োগ হয়েছে ট্রেনের ধাক্কায়। এই ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঠেকাতে রেলমন্ত্রককে ১০টি পরমার্শ দিয়েছে বনমন্ত্রক। ১৪টি সংগঠন এই বিষয়ে রেলমন্ত্রকের কাছে সর্তকতা অবলম্বনের কথা বলেছেন। যেমন রেললাইন সংলগ্ন স্থানে হাতিদের বাসস্থান চিহ্নিতকরণ, বিশেষ বিশেষ স্থানে ধীরগতিতে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা, রেললাইনের ওপর খাবার না ফেলার জন্য যাত্রী সাধারণকে সচেতন করা, বন্যপ্রাণীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, এবং নতুন লাইন সম্প্রসারণের সময় হাতি করিডর (যাতায়াতের পথ) গুলিতে বিশেষ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি।

উত্তর পূর্ব ভারতের অসমে সবচেয়ে বেশি হাতির অপমৃত্যু ঘটে ট্রেনের ধাক্কায়। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে রেকর্ড ট্রেন ধাক্কায় একজন গর্ভবতী মা-হাতির সাথে ৬টি হাতির মৃত্যু ঘটেছে। এই মর্মান্তিক মৃত্যু কি কোনভাবেই প্রতিরোধ করা যায় না?

যে দেশে রাজধানী শতাব্দীর মত দ্রুতগতির ট্রেন, সুপারসেনিক প্লেন, নিয়মিত উপগ্রহ-অনুগ্রহ উৎক্ষেপণ চলছে সেদেশে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতি এই অবিচার কি মেনে নেওয়া যায়?

যেকোন অবিচারই কাম্য নয়।

ম্যামথ যুগের অবলুপ্তি ঘটেছে। আমাদের শৈশবের হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে/ সোনামণির বে' কিংবা 'হাতি মেরে সাথী' 'দামু' ইত্যাদি চলচ্চিত্রায়ণে হাতির মানবিক চেতনা ও বোধের বহিঃপ্রকাশ শুধু সেলুলয়েডেই থেকে যাবে একদিন প্রকৃত রূপে প্রকৃতি সংরক্ষণে সচেতন হস্তক্ষেপ না ঘটলে বর্তমান যুগের হাতিরও অবলুপ্তি ঘটবে। স্থান পাবে যাদুঘরের ফসিলস্তূপের অবয়বে। অবশেষে বলি প্রিয়বচন মরা হাতি লাখটাকা জেনেও একদিন একজন আমাদের হাহাকার করতে হবে। সাচ্চাই বাত/ হাতিকা দাঁত। হাতি আমাদের সভ্যতার বিবর্তনের এক অন্যতম সহযাত্রী বা সহযোদ্ধা। তাকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য!

প্রয়াত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাহিত্যের হাতেখড়ি ছড়া-কবিতা থেকে আরম্ভ করে পরে পরে ভ্রমণকাহিনী, গান, গীতি আলেখ্য, শিশুনাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ নানা স্বাদের রচনা শহর-নগর-গ্রামের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যাঁর সাহিত্যে কীর্তি সেই অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রয়াত হলেন ইংরাজী ১০ জুন ভোর রাত্রে বহড়ু গ্রামের নিজ বাসভবনে। মাতুলালয় হরিণাভি গ্রামে বাংলা ১৩৩৪ সালের ৬ চৈত্র জন্মেছিলেন। পিতৃকূল ও মাতৃকূলের সর্বাঙ্গীণ সাহিত্যসাধনার ধারায় লালিত তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। ভ্রমণ বিষয়ক কয়েকখানা গ্রন্থ ও শিশুনাটক 'আলোর দেশ' প্রকাশিত। এই বিষয়গত কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত হয়ে রইল। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শেষের দিনগুলিতে অক্ষমতা অনুভব করছিলেন তিনি।

স্বতন্ত্র নাগরিক চেতনার কবি সমর সেন

সৌম্য সেনগুপ্ত

[সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এর লেখা ট্যাকসই হবে বলে বোধ হচ্ছে – সমর সেনের কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ]

কবি সমর সেনের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সবচেয়ে আগে মনে রাখতে হবে মাত্র আঠারো বছর তাঁর কবিজীবন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৪ তাঁর কবিতার নির্মাণব্যাপ্তি। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'কয়েকটি কবিতা'। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ'। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় 'নানা কথা' (১৯৪২) 'খোলাচিঠি' (১৯৪৩) 'তিনপুরুষ' (১৯৪৪)। ১৯৫১ সালে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা সংলন 'সমর সেনের কবিতা'। এপর কবিতা লেখার জগৎ থেকে কবি নিজেকে নির্বাসিত করেন স্বেচ্ছায়। এই স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে নানা মত আছে। নিজেকে কবিতার জগৎ থেকে নির্বাসিত করার বেশ কিছু বছর পরে তিনি বেছে নেন সাংবাদিক জীবন। সেখানে যে আলোড়ন, যে ঝড় তিনি তুলতে সক্ষম হয়েছেন বাঙালি সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা এক স্বতন্ত্র মাত্র রেখে গেছে। কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচনায় আমরা 'কবি সমর সেন'-কে নিয়ে মূলত আলোচনা করব। সাংবাদিক সমর সেনকে নিয়ে নয়।

সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'য় আমরা পাই এক নাগরিক কবিকে যিনি বাস্তবের প্রখর দাবদাহের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের সাথে সাথে নগরজীবনকে উলঙ্গ করেছেন। কশাঘাত করেছেন নির্মমভাবে। এই সংকলনটি যখন প্রকাশ পায়, তখন সমর সেনের বয়স মাত্র একুশ; যদিও কবিতাগুলি লেখা শুরু হয়েছে ১৯৩৪ সালের অর্থাৎ ১৭ কী ১৮ বছর বয়সে। স্বাভাবিকভাবে এই সদ্যকৈশোর থেকে ভরা তারুণ্যে পা দেওয়া এক কবি রোমান্টিসিজিমের প্রতি আসক্ত থাকবেন এটাই যথার্থ হওয়া উচিত। কিন্তু সমর সেনের সমসাময়িক কবিরা সেদিকে পা বাড়ালেও তিনি তাঁর কবিতায় আনলেন নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা আর দ্বন্দ্বকে। "স্তব্ধ রাতে কেন তুমি বাইরে যাও?/ আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার/ বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে,/ হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা, / কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধ রাতে/ আমাকে একলা ফেলে? / কেন তুমি চেয়ে থাকো ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো? / 'নিঃশব্দতার ছন্দ' কবিতায় এভাবেই শুরু করেন সমর সেন। শেষ করেন এইভাবে – "মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি / তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ / সহসা বুঝতে পারি – / দিনের পরে কেন রাত আসে/ আর তারারা কাঁপে আপন মনে, / কেন অন্ধকারে / মাটির পৃথিবীতে আসে সবুজ প্রাণ;/ চপল, তীব্র, নিঃশব্দপ্রাণ– / বুঝতে পারি কেন / স্তব্ধ অর্ধরাত্রে আমাকে তুমি ছেড়ে যাও/ মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের

স্তব্ধতায়"।

রোমান্টিসিজিমের বিপরীতে গিয়ে কবি এক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হন যেখানে রঙিন নয় সাদা-কালো বা ধূসর চিত্রকল্প নাগরিক জীবনের প্রচ্ছায়া হয়ে ওঠে। কবির বোধ বলে দেয় আলোয় নয়, অন্ধকারে মাটির পৃথিবীতে সবুজ প্রাণ আসে, সে প্রাণের স্বরূপ একদিকে 'চপল' 'তীব্র' আবার অন্যদিকে 'নিঃশব্দ'। এখানেই রোমান্টিকতা থেকে অ-রোমান্টিকতার দিকে কবির যাত্রা শুরু হয় আবার কবি যখন লেখেন "ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি/ বাতাসে ফুলের গন্ধ,/ বাতাসে ফুলের গন্ধ/ আর কিসের হাহাকার।" (একটি রাত্রির সুর) অথবা লেখেন "মেয়েটি চোখ মেলল বাইরের আকাশে / সে চোখে নেই নীলার আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা,/ শুধু কিসের ক্ষুর্ধাত দীপ্তি, কঠিন ইশারা / কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে।" (নাগরিকা), অথবা যখন লেখেন "বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা, বর্ষাকালে, /অনেক দেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে, / ভাসবে মুক পশু আর মুখর মানুষ,/ শহরের রাস্তায় যখন/ সদলবলে গাইব দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক/ তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস/ ফিরে তুমি যাবে বিবাহিত প্রেমিকের কাছে,/ হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও, সন্তানধারণে? মেঘদূত)– তখন আমরা বুঝে নিতে পারি গদ্য কবিতার এক উত্তরাধিকার কবি সমর সেন বৈপরীত্য চেতনার মধ্য দিয়ে খুঁজে চলেন। এই খোঁজ চলে সময়ের গর্ভ থেকে জাত আসন্ন দ্বন্দ্বগুলোকে অত্যন্ত নিরুচ্চারে প্রকাশ অথচ জীবন দর্শনের এক স্বতন্ত্র বলিষ্ঠতায়।

সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে বিষ্ণু দে কবির আত্মগত শিল্পসৌন্দর্য ও প্রখর সমাজদৃষ্টির উল্লেখ করে নাগরিক কবি হিসাবে তাঁকে অভিষিক্ত করেন 'পরিচয়' পত্রিকায়। কিন্তু সমর সেন কি শুধুই একজন 'নাগরিক' জীবনের চেতনাঋদ্ধ কবি ? মনে রাখতে হবে সমর সেরনর 'নগর' কিন্তু কলকাতা শহর। আর সেই শহরের সময়কাল ঔপনিবেশিক ইংরেজদের ক্ষয়িষ্ণু সময়, যুদ্ধবিধ্বস্ত, দাঙ্গাবিধ্বস্ত, দুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত, স্বাধীনতাপূর্ব টালমাটাল কলকাতা। একদিকে রাজনৈতিক দৈন্য, দেউলেপনা, গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রবল আসক্তি, ধর্মের বাতাবরণে দেশভাগের হাতছানি, তার থেকে জাত দাঙ্গার তীব্রতা, অন্যদিকে চোখে কমিউনিজমের স্বপ্ন, বিশ্বসমীক্ষায় ধরা পড়া আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, ফ্যাসিবাদবিরোধিতা ইত্যাদির সংকুলানে এক তীব্র মোহে মধ্যবিত্ত বাঙালির আবিষ্ঠতা এইসব কিছুই সমর সেনের কবিতার ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি কেন কবিতায় জীবনের আর প্রগতির সমর্থনে সোচ্চার নন; বরং এসবের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তিনি অবলোকন করছেন চলমান নাগরিক জীবনের ক্লেদাক্ত, গ্লানিময় এক সার্বিক অবক্ষয়ের ছবিকে?

আসলে এই অবক্ষয় তিরিশ দশকের শেষে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে নানাভাবে ব্যাপ্ত হয়েছিল; যে সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের মধ্যে সমর সেন দেখতে পেয়েছিলেন ছিন্নমূল ও বিদীর্ণ সত্তার পরিত্রাণহীন বিপন্নতা যা চিরায়ত কল্যাণ ও সুন্দরের আদর্শ দিয়ে মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যখন মানবতাগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিনাশক রূপ

নিয়ে ইউরোপে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন ঔপনিবেশিক বাংলায় কবির চোখে পড়েছিল কেবলই আত্মিক বন্ধ্যাত্বের উপশমহীন ছবি। পুঁজিবাদী নাগরিক সভ্যতার বিদায় সমর সেনের মনোভূমিতে যত চমৎকার প্রকট হয়েছে, ততখানি আর কারও ক্ষেত্রেই হয়নি। যে স্বাতন্ত্র্যবোধ কবির নিজস্ব দর্শন সেটাই তার অভিজ্ঞানস্বরূপ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে সততার সাথে। তাই তাঁর অমোঘ উচ্চারণ "দিন নেই, রাত নেই, বারে বারে চমকে উঠি / শুধু মনে পড়ে, / কঠিন অন্ধকারে অবরুদ্ধ বাতাস/ দেওয়ালের উপর বিষন্ন ছায়া,/ আর তোমার পাশে/ রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত আমার দীর্ঘশ্বাস।" (চার অধ্যায়)

মধ্যবিত্ত জীবনের অবসাদ, ক্লেদ আর হীনস্মন্যতা যখন সংশয়াতীতভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে তখন বিপ্লবের বিলাসবাসনা কবিকে একবারের জন্য প্রতারিত করে না। তখন তিনি আত্মসমর্পণের ভাষায় বলে ওঠেন – "আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে / আজ তোমার আবির্ভাব হল,/ স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক / রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,/ আর সমস্ত দেহে কামনা নির্ভীক আভাস, / আমাদের কলুষিত দেহে/ আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে / সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।" (একটি মেয়ে)

মোহের ছায়াবাদে নিজেকে আচ্ছন্ন করেন না কবি। তাই প্রেম থেকে প্রেমহীনতার দিকে তাঁর যাত্রা জারি থাকে কবিতার স্পষ্ট উচ্চারণে ; – "বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে / তোমাকে পাবার বাসনা, / আর মাঝে মাঝে আকাশে হলুদ রঙের অদ্ভুত চাঁদ ওঠে / চঞ্চল বসন্ত কাঁপে গাছের পাতায়,/ আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ / পড়ে থাকে অলস স্বপ্নের মতো / সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত্রি ভরে / তোমাকে পাবার বাসনা/ বিষাক্ত সাপের মতো। (প্রেম) কবির চেতনায় নষ্ট সময়ের ডাক বারবার ফিরে আসে; অবক্ষয়ী সময় আর সমাজের মুখোমুখি হয়ে কবি তাই স্বীকারোক্তির সাহস দেখান এইভাবে – "রাত নেই, দিন নেই, বারে বারে চমকে উঠি, / আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই, / স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন, –" অথবা "ম্লান হয়ে এল রুমালে / ইভিনিং ইন প্যারিসের গন্ধ/ হে শহর হে ধূসর শহর কালীঘাট ব্রিজের উপরে কখনও কি শুনতে পাও / লম্পটের পদধ্বনি/ কালের যাত্রার শব্দগুলিতে কি পাও/ হে শহর হে ধূসর শহর . . . 'আমি নহি পুরুরবা হে ঊর্বশী' / মোটরে আর বারে / আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে / কয়েক টাকায় / কয়েক প্রহরের আমার প্রেম/ তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জ্বলে / বাঘের চোখের মতো।" (স্বর্গ হইতে বিদায়), অথবা "আর মধ্যরাতে মাঝে মাঝে বলি / মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও, / পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী অনো/ হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন / কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে / সকালে ঘুম ভাঙে/ আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে/ বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।" (একটি বেকার প্রেমিক)

নাগরিক অবক্ষয়ের দোলাচলে কবি কখনও বা প্রার্থিত জীবনের ইঙ্গিত পান, কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবের নগ্নতা তাকে গ্রস্ত করে বিকলাঙ্গ সভ্যতার আগ্রাসী বিবরে।

টি. এস. এলিয়টের আধুনিকতাবাদের পথচারী ছিলেন সমর সেন। আবার মার্কসবাদের বীক্ষণ ও চেতনা ধারণ করেছিলেন তিনি। তাই 'অবক্ষয়ী কবিতা' নির্মাণ

করার মধ্যেও কখনো কখনো তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে এক অবক্ষয় থেকে জাত আর এক অবক্ষয় বিরুদ্ধ উচ্চারণ "আমার মনে শান্তি নেই/ যদি ঝড় নেমে আসে/ শব্দের আকাশ চূর্ণ করে / অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে,/ ঝড় নেমে আসে বিশাল, গভীর অন্ধকারে/ তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে"। (ঝড়)

আসলে এলিয়ট তাঁর ডেকাডেন্স পোয়েট্রি অবলম্বন করে একসময় চেয়েছিলেন ক্যাথলিক আস্থার মধ্যে শান্তি। কিন্তু সমর সেনের সামনে সে পথ খোলা ছিল না। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার রাস্তাটি হেঁটে শেষ করে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সমর সেন তাঁর বিরুদ্ধে পথে হেঁটে অবক্ষয়ী নাগরিক জীবনের চিত্র তুলে ধরলেন কবিতায়। কিন্তু চেতনায় মার্কসবাদের প্রচ্ছন্নতা কাজ করে গেছে কোথাও কোথাও সুপ্তভাবে। তাই তাঁর কিছু কিছু কবিতায় তা ধরা দিয়েও অধরা হয়ে রয়েছে অবক্ষয়ী নির্মোহ সত্যের উদ্ভাসে।

"তবু জানি, কালের গলিত গর্ভে থেকে বিপ্লবের ধাত্রী/ যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,/ তবু জানি, / জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে/ আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে . . . "। কিন্তু তারপরই লেখেন –"ততোদিন নারী ধর্ষণের ইতিহাস/ পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষ হীন পড়া / অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো, / ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে/ বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার" (ঘরে বাইরে)

মধ্যবিত্ত অবক্ষয়কে সামনে রেখে সমর সেন চিত্রকল্প রচনা করেন তার কবিতায়, সেখানে যেন এক লহমায় তিনি খুলে ফেলেন ভণ্ড আবরণ, সেখানে সামাজিক সত্তা আর ব্যক্তিসত্তা কোথাও যেন এক বিন্দুতে মিলে যায়। – "পলায়ন ছাড়া বেরুবার পথ জানা নেই।/ চক্রব্যূহে ঢোকা কেন প্রয়োজন/ অলস চোখে তার শান্ত সমর্পণ, / কঠিন বুক দুরুদুরু কাঁপে,/ অনাগত কার পদধ্বনি / চাবিতে বন্ধ দুয়ার, / অন্ধ ঘরে একলা থাকি/ রক্তের জোয়ার হৃদয় কাঁপায়/ মুহূর্তের সমর্পণের দারুণ সাহস ছাড়া / ভীরু মজ্জায় আর কিছু নেই।" (গ্রহণ)

মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের ভণ্ডামির সাথে সাথে রাজনৈতিক আদর্শের প্রসাধনে বিপ্লবী মুখের অন্তরালে পাতি বুর্জোয়া মুখগুলিকেও তিনি চিহ্নিত করেন এইভাবে – "দেশবন্ধু পার্কে এলোমোলো পলায়ন, / আজো মনে পড়ে। / তখন কারো কারো মুখে শুনেছি / গণ আন্দোলনের তত্ত্বকথা / শুনেছি, মহাত্মাজীর অহিংসা পণ্ডশ্রম, / ভণ্ডামী মাত্র।/ অকেজো আত্মম্ভরিতায় সহসা ভেবেছি / আর যাই হই/ নির্বিষ অহিংস ক্লীব নই . . ." এই কবিতার এই উচ্চারণের পর কবির স্বগতোক্তি – "আত্মার অজ্ঞাতসারে / পুরাতন প্রগলভ দিনরাত্রি আসা যাওয়া করে, / নদীর জোয়ারে অন্ধকারে তিলে তিলে পৃথিবী মরে/ বুঝি পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক" – (রোমন্থন) । আবার মধ্যবিত্ত সুলভ আত্মশ্লাঘায় হয়তো সমর সেনই বলে উঠতে পারেন – "তারপর চায়ের দোকানে বসে সহসা ভেবেছি, / আজকাল ঘরে ঘরে সমাজধার্মিক অনেক,/ মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি / মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান,/ তুমি ছিলে তারি একজন, / এ অধমও তারি একজন।" (কয়েকটি মৃত্যু)

'আমি' সমর সেনের কবিতার মধ্যবিত্ত সত্তা। ১৯৪০-এর দশকের 'আমি', শহরের

মানুষ নগরজীবনের ক্লান্তি অবসাদ বিকার সেই 'আমি'তে প্রতিফলিত। কিন্তু সে 'আমি'র দ্বান্দ্বিক তাৎপর্য এইখানে যে এর আত্মসচেতনতা এই 'আমি'কে করে তোলে সময়ের প্রতীক। এ যেন এক খণ্ড 'আমি'র ভিতর দিকে সমগ্র 'আমি'কে প্রত্যক্ষ করা, স্পর্শ করা এই দশকের কোথাও যেন সমর সেনের 'আমি' আমরা হয়ে যায়। কারণ এই সময় হল সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময় যখন একদিকে দেশভাগ আর স্বাধীনতার যুগপৎ প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম আর কমিউনিজমের শিকড় গ্রথিত হচ্ছে ভারতবর্ষের বুকে। কিন্তু সেখানেও রয়ে যাচ্ছে প্রভূত দ্বিধা আর অসীম সন্দেহ। সমর সেন কি অনাগত কালকে এভাবে দেখতে পেয়েছিলেন ? না হলে তিনি লিখবেন কেন – "লেনিনগ্রাড ঘেরাও, / যেন তাদেরই বাজীমাত/ স্বদেশী বন্ধুরা কোলাহল বাধায়/ চাকরি খালির বিজ্ঞাপনের বেকারের সকাল শুরু/ শূন্যমনে সকালে ওঠে, মুরগী আর কুকুর ডাকে / দুপুরে ঘুঘু ডাকা বিষণ্ণতা,/ গোধূলিতে বিবেক দংশন, অনাগত সর্বনাশ/ যেন আসে দেওয়ালের পাশে, / দেশে দেশে পড়ন্ত প্রাচীন।" (নানা কথা – সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে) অথবা তিনি লেখেন – "অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি/ অনেক লোক যেখানে/ সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে, / কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায় / সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার,/ গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে।" (নববর্ষের প্রস্তাব ঃ সোমেন চন্দের স্মৃতিতে)

সমর সেনের 'আমি' এখানে 'ব্যক্তি' আমি থেকে এক সর্বগ্রাসী 'আমি'তে পরিণত হয়। 'যেখানে অনেকে খেয়া পারাপার করে কিন্তু 'গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে'। প্রকৃতপক্ষে সময়ের অভিঘাত সেই সময়ের অন্যান্য কবিদের মতো সমর সেনকেও বিচলিত করেছিল স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু সমর সেন তাকে তাঁর কবিতায় ধারণ করেছেন অন্যভাবে। তাঁর আত্মমগ্ন দর্শনে নিজের মতো করে। তাই তিনি ঘোষণা করেন – "পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্তানে, / হে সরকার, হুজুর সরকার / হুজুর বড়লাট জঙ্গী লাট, বর্মবীর আলেকজাণ্ডার/ আমরা বান্ধা এখনো,। তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে / ইতিহাসের জাঁতাকলে, আত্মঘাতী নসীবের ফলে।" (খোলা চিঠি) অথবা তিনি বলে ওঠেন স্বগত স্বীকারোক্তির মতো – "একে একে লুপ্ত দেশ, নারকীয় অন্ধকারে/ তবুও আলোর চুম্বকস্তম্ভ এদিকে ওদিকে বাড়ে/ ভুলে, ভ্রান্তিতে, উৎকণ্ঠায় নতুন জীবনের ছাপ/ আমাদের চেতনায় পড়ে।" (ক্রান্তি)

সমর সেন মার্কসবাদের চেতনার বিশ্ববীক্ষাকে গ্রহণ করেন বা আয়ত্ত করেন নিজস্ব জীবনের মৌল নীতিগুলিকে সেই দর্শনের মধ্যে বিশ্বস্ত করে তোলার মাধ্যমে। শৌখিন মজুদুরি বা দেখনেওয়ালা মার্কসবাদীদের মতো শুধুমাত্র যান্ত্রিকভাবেই তিনি এই দর্শনকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই নিজের মধ্যবিত্ত সত্তা আর অবস্থান সম্বন্ধে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল থেকেই তিনি তাঁর সীমারেখাকে অতিক্রম করতে চাননি কোনোদিন। মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষা সভ্যতা আর জীবন সম্বন্ধে তাঁকে যেমন প্রাণিত করেছিল, তেমনি সমসাময়িক কালের ঘটনাবলি ও তার থেকে জাত দ্বন্দ্বগুলো তিনি অস্বীকার করতে পারেনি কোনোভাবে। তাই বাস্তবের অভিঘাত হয়তো তাঁকে সেই সময় বা যুগ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে

তুলেছিল বলেই তাঁর কবিতার গদ্যভাষা এতটা কঠোর; মানুষের জন্য স্বপ্ন তৈরি করার চেয়ে সময়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়ার কাজটা অত্যন্ত সৎভাবে করে গেছেন সমর সেন তাঁর কবিতায়। আর যখন সেই কাজের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সমর সেনের কাছে কবিতা লেখার কাজটিও হয়ে গেছে অনাবশ্যক। "আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট / অনেকে জিজ্ঞাসা করে গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে / তোমার তফাৎটা কী? তফাৎটা এই / বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বারবার / অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায় / এক ঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন / কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আমি/ দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,/ বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর/ ভাগ্যবান একদিকে বিপুলা যশোদা / নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।/ জীবনযাত্রার গতি বদলাতে তাই/ বিশেষ আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও দেখিনি।/ আর্টের কৈবল্য শুধু/ আত্মচর্চার ধারালো সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে / প্রাণের গম্বুজে আমার এ যাত্রা।" অথবা "লেনিন, স্ট্যালিন, জুখভ্ ও গোর্কি/ তাদের আমরা চিনি, কিন্তু বুঝি না তাকে, / দুধ আর তামাকে সমান আগ্রহ যার/ দু-নৌকার যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,/ বুঝি না নিজেকে"। (২২ শে জুন) নিজের বুদ্ধিজীবীর শ্রেণি অবস্থানকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে এভাবেই রক্তাক্ত করেন কবি ; উন্মোচিত করেন তথাকথিত মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতায় ঢাকা মেকি প্রগতিবাদের স্বরূপকে। এই বিবেকি দংশন থেকে তাঁর রক্তক্ষরণ ক্রমশই বাড়তে থাকে। এই রক্তক্ষরণ হয়তো কবিতা দিযে ঢাকা যাবে না ভেবেই কবিতার কলম নামিয়ে রাখেন স্বেচ্ছায়। তাই তাঁকে অন্য এক বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে লিখতে হয় – "শুনি না আর সমুদ্রের গান / থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন, / ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি/ একদা দিগন্তে দেখা উদ্যত পাহাড়,/ বাইজীর আসরে শোনা বসন্তবাহার/ ভুলে গেছি বাগবাজারী রকে আড্ডার মৌতাত/ বালিগঞ্জের লপেটা চাল/ আর ডালহাউসীর আর ক্লাইভ স্ট্রিটের হীরক-প্রলাপ/ ডাকে জাহাজের বিদেশী ডাক,/ রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়। . . . যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে, / বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে।" (জন্মদিনে)

এভাবেই কবিজীবনের সমাপ্তি ঘটাতে হয় সমর সেনকে। এছাড়া তাঁর আর করারই বা কী ছিল ? নিজের চেতনার স্তরে নানা মানসিক কাটাকুটি খেলার পর কবি বুঝেছিলেন যে বিশ্বাস থেকে একদিন তাঁর কবিতা লেখা শুরু বাস্তব সময় তাকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে; নতুন করে বিশ্বাসের জন্ম 'সেই সময়' হয়তো তাকে দিতে পারেনি বলে এই স্বগত উক্তির মধ্য দিয়েই কবি হয়তো আকাঙিক্ষত জীবনের রসদশূন্য বোধকে নির্লিপ্তির প্রকাশে ব্যক্ত করেন।

কবির এই নির্লিপ্ত থাকা, এক জীবনসত্য, যে জীবনসত্যকে কবি ইচ্ছা করেই অতিক্রম করতে চান না শুধুমাত্র কবিতা লেখার জন্যই কবিতা লেখার কথা ভাবা কলাকৈবল্যবাদী ধারণার স্বভাববিরুদ্ধতা থেকে।

সমর সেনের এই কবিতার লেখা ছেড়ে দেওয়াটা হয়তো আর এক প্রস্তুতিপর্ব পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক আর গদ্য রচয়িতা সম্পাদক হয়ে ওঠার। সত্তর দশকের টালমাটাল

সময়কে সাক্ষী রেখে কবিতার ভাষায় নয় গদ্যের ভাষায় এক মহাকাব্যিক বোধের নতুন জন্ম দিয়েছিলেন সমর সেন সংবাদপত্র সম্পাদনার হাত ধরে। যদিও কোনো পূর্ণতায় নয়, সেখানেও তাঁর অন্বেষণের অনিঃশেষ দীপ্তি বিরাজ করেছিল অন্ধকার ঘরে জ্বলা একলা একটি মোমবাতির আলোর মতোই।

ঋণস্বীকার ঃ

১) অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা
২) সমর সেনের কবিতা – সমর সেন
৩) কবিতীর্থ জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য সমর সেন সংখ্যা

পটুয়া ও পটগান

পটুয়া পট আঁকেন, গান গেয়ে বেড়ান ঘরে ঘরে গিয়ে, বেহুলা লখিন্দর, মনসা, শীতলার কথা পটে এঁকে সুরে গেয়ে বেড়ান উপায়ের তাগিদে। কিন্তু ভাবটা এই যেন তাঁরা ভিক্ষে করে উপায় করেন। আর যাঁরা চাল পয়সা দেন তাঁরাও যেন ভিক্ষেই দেন। দিনের পর দিন বাপের পর ছেলের কাছে সেই একই গান, একই বিষয়, একই ছবি কে আর দেখবেন শুনবেন এই নিয়ে ভাববেন। তাই এক সময়ের শিল্পীর সৃষ্টি কালে কালে ভিক্ষে করে উপায়ের ধান্দা হয়ে দাঁড়ায়। গঞ্জে আর গাঁয়ের উঠানে পটগান হলে কৌতুহলে হয়ত কোথাও বা ভিড় জমে যায় আর গান শেষ করে পট গুটিয়ে নেবার আগে ভিড় কমে যায়। বিচিত্র শিল্পীর নেশা — এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরে বহু পটুয়া এখনো পট আঁকেন গান গেয়ে যান আর হতাশায় ভুগতে থাকেন। পটের তুলি তুলে পাশে চেয়ে দেখতে পান কে যেন হাতছানি দিয়ে টাকার থলি নিয়ে ডেকে গেলেন তাঁর কাছে যেতে — সব সমস্যার সমাধানের আশা দিয়ে। আশার আলোর ছটায় মুগ্ধ হয়ে তুলি পট এক জায়গায় করে বগলে নিয়ে দৌড়ে যান— তাড়াতাড়ি এঁকে ফেলেন কালি তুলি পটে নানা কাহিনী। জানা গেল যে ওদের মন খুলে দেখানো সবরকম পট ও গান ভিডিও ক্যাসেটে তুলে রাখা হয়েছে। ঐতিহ্যের বাহকরা সেই পট-তুলি বগলে নিয়ে হেথায় হোথায় গান গেয়ে ভিক্ষের মতো পয়সা নিয়ে হতাশার ঐতিহ্যের ঘরে ফেরেন। কোন কোন পটুয়া হতাশার জাল ছিঁড়ে প্রতিমা গড়ার পোটো হয়ে অর্থ উপায় করেন। পটগানের শিল্পীদের দুঃখ এই যে, নামী শিল্পী মারা গেলে অর্ধেক চাপা পড়ে কবরের মাটিতে আর অর্ধেক চাপা পড়ে মিউজিয়ামের ধূলোয়। জীবন্ত শিল্পীদের চুপসে যাওয়া মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে শিল্পীদের ইতিকথা জেনে যশোপ্রার্থী পণ্ডিতের অর্থপ্রাপ্তিও হয়। এদিকে চিন্তিত শিল্পীর মুখের বিড়ির আগুন টানতে টানতে সুতো পুড়ে ঠোঁটের একদিকে ছ্যাকা লাগে আর কঁকিয়ে কঁকিয়ে গেয়ে ওঠেন — 'সরকার যদি দয়া করে করেন কিছু দান'। কখনও দল বেঁধে গেয়ে চলেন ঃ

পটুয়ার সুখের কথা শুনো দিয়া মন। পটে ঘটে পট আঁকিয়া চলি সর্বক্ষণ।।
কোথায় গেল মা মনসা বেহুলা লখিন্দর। ঘরে ঘরে ভেবে মরে শত চন্দ্রধর।।

পরবর্তী অংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়

উন্নয়ন সাংবাদিকতা

সুব্রত কুণ্ডু

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশনের প্রকাশিত 'ম্যানুয়াল ফর নিউজ এজেন্সি রিপোটার্স' পুস্তিকায় বলা হয়েছে — উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা দারিদ্র দূর করতে; অঞ্চল এবং শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করতে; পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি করতে ; ধর্মান্ধতা, জাতি বিবাদ, কুসংস্কার, সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজকে মুক্ত করেত; ধীরে অথচ সুস্থায়ী পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক সাবলম্বনের জন্য সচেষ্ট হবে। উন্নয়ন মাপা উচিত মানুষের জীবনধারার মান ও প্রকৃতির উন্নয়নের ভিত্তিতে এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ সর্বোপরি বিশ্বের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিরিখে।

বর্তমানে যে সব কাজ হচ্ছে সেগুলিই ভবিষ্যৎ তৈরি করবে — এই ধারণা এবং উন্নয়ন পদ্ধতির মধ্যে মানুষের অংশগ্রহণ যে জরুরী এই উপলব্ধি তৈরি করা উন্নয়ন সাংবাদিকতার লক্ষ্য।

উন্নয়ন অজাগতিক শক্তি প্রদত্ত কোন উপহার নয়। পরিকল্পনা মাফিক কাজ ও পরিশ্রমের ফসলই হল উন্নয়ন। যেহেতু উন্নয়ন সাংবাদিকতা সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ, সেই কারণেই মানুষের গঠনমূলক কাজ এই সাংবাদিকতায় প্রতিফলিত হয়।

উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে শুধুমাত্র মানুষের অংশগ্রহণে সফল কর্মসূচির কথাই উল্লেখ হয় না। যে সব কর্মসুচি সমাজের হিত সাধন করছে না, যে কাজে মানুষের অংশগ্রহণ নেই এবং যে কাজগুলির উন্নয়নের পরিপন্থী — সেইসব কাজের কথাও উল্লেখ করা হয়।

কাজটি একটু কঠিন। কারণ এই ধরণের প্রতিবেদন, নিবন্ধ, প্রবন্ধ যে সাংবাদিক লিখবেন তার উন্নয়ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। একই সাথে উন্নয়নমূলক কাজে মানুষের অংশগ্রহণ কিভাবে সম্ভব তা জানা দরকার। কেন নির্দিষ্ট কার্যক্রমটি ভালো বা কেন ভালো নয় — সে সম্পর্কে নিজের ধারণার থেকে সমাজের সমষ্টিগত ধারণার প্রাধান্যই এই সাংবাদিকতায় প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা বেশিরভাগ সময়ে উত্তেজনাপূর্ণ, রোমাঞ্চকর হয়না। কারণ উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বেশ কিছু সময় ধরে কাজ করার পরেই সুফল পাওয়া যায়। তবে কাজটি সফলভাবে চললে বা সমাপ্ত হলে এবং তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সম্বলিত লেখা প্রকাশিত হলে তা পাঠকের ভাবনাচিন্তার খোরাক হিসাবে কাজ করে এবং তাকে সমাজের জন্য কাজ করার উৎসাহ জোগাতে পারে।

উন্নয়ন বিষয়ক লেখা তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে, এই লেখা কাদের জন্য লিখছি। এরকম হতেই পারে, এমন একটি বিষয়ে লেখা হোল যা পড়ে পাঠক তার অবস্থা, সমাজ, পরিবেশ ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই মিল খুঁজে পেলেন না। এরকম লেখা পাঠকের কোন কাজেই লাগেনা এবং সম্পুর্ণ পরিশ্রমই বিফলে যায়। যে বিষয় কর্মসূচি, প্রকল্প, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে লেখা হবে তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বর্তমান অবস্থা অবধি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। এই লেখায় সম্ভাব্য সমাধান, সুযোগ, পদক্ষেপ ইত্যাদির বর্ণনাও রাখা দরকার যাতে পাঠক উন্নয়নমূলক কাজ করার সঠিক দিশা

পেতে পারেন। একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী তাদের কথা শোনা দরকার। যারা এই প্রকল্পের উপভোক্তা অর্থাৎ যারা উপকৃত হচ্ছেন তাদের কথা অবশ্যই শুনতে হবে। ব্যক্তির নাম এই লেখাগুলিতে উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্প বা কর্মসূচির জনসংযোগকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সাথে কথা বলার সময় বেশি সচেতন হওয়া দরকার। কারণ তাঁরা প্রকল্পটির ভালো দিক গুলি বলার জন্যই থাকেন — যা অনেক সময় অতিকথন বা মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু তাঁদের কথাই শুধু উল্লেখ করলে লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। একই ধরণের কিন্তু ভিন্ন এলাকার কাজের তথ্যের খোঁজ করা দরকার। লেখার আগে এর সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার তুলনা করা দরকার। প্রয়োজনমত লেখাগুলিতে আশেপাশের এলাকার একই ধরণের প্রকল্পের উল্লেখ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে — যথা সম্ভব তাদের বক্তব্য উদ্ধৃতি চিহ্ন-এর মধ্যে তুলে ধরা উচিত। এতে পাঠক বোধ করবে কর্মসূচি — সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলছেন। পক্ষপাতিত্ব ছাড়তে হবে। যদি বিপরীতধর্মী মতামত পান তবে সব মতামতই উল্লেখ করুন। সতর্কভাবে ঘটনা ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করুন। আপনার নিজস্ব ধারণা, বিশ্বাস, সংস্কার অনুযায়ী এগুলি কাঁটা ছেঁড়া করা উচিত নয়। মনে রাখবেন, আপনি উন্নয়ন সম্পর্কিত লেখা লিখছেন — কোন নির্দিষ্ট 'মতবাদ' প্রচার করছেন না। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সব বই পত্রপত্রিকা পেলেন সেগুলিই পূনর্লিখন করা উচিত নয়। এগুলিকে আপনার অনুসন্ধানী বা গবেষণাধর্মী লেখার প্রাথমিক সূত্র হিসাবে ব্যবহার করুন। আপনি লেখায় আপনার সমালোচনামূলক বক্তব্য অবশ্যই লিখতে পারেন। তবে সেই সমালোচনা সবসময়ই গঠনমূলক হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমালোচনার একটা দিশা থাকবে যা প্রকল্প কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করবে। মনে রাখবেন আপনি উন্নয়নমূলক লেখা লিখছেন মানুষ, সমাজ, দেশ সর্বোপরি বিশ্বের জন্য। অর্থাৎ সমাজ গঠনের অগ্রণী বাহিনীর একজন দায়বদ্ধ সদস্য হিসেবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করছেন।

উন্নয়ন বলতে আমরা অনেকেই আর্থিক উন্নয়নের কথা বলি, তা সে দেশের ক্ষেত্রেই হোক বা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে হোক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক উন্নতি সার্বিক উন্নয়ন মাপকাঠি হিসাবে ধরা যায় না। যেমন ধরা যাক, আমরা খাদ্য উৎপাদনের স্বয়ম্ভর। কিন্তু একথাও সত্যি যে, এদেশের অনেক মানুষ এখনও আধপেটা খায় ও অনাহারে থাকে।

এর কারণ অনেক থাকতে পারে। কিন্তু মোদ্দা কথা হল, মানবিক মূল্যবোধ, সুবিচার, নিরাপত্তা ও সাম্য না থকলে আর্থিক উন্নয়ন বা সম্পদ বৃদ্ধি ঘটলেও তাকে উন্নয়ন মনে করা যায় না। অর্থাৎ উৎপাদন পরিকাঠামোর প্রসার ঘটলে বা উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও — উপরোক্ত বিষয়গুলির গুনগত পরিবর্তনও না হলে কিছুতেই মানুষ এবং প্রকৃতির উন্নয়ন ঘটানো যায় না।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে উন্নয়ন সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য হল — সমাজে সাম্য, সুবিচার, নিরাপত্তা মূল্যবোধ ইত্যাদির গুণগত পরিবর্তনের জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করা।

আর বিশদে বলতে গেলে ——১) মানুষকে তাদের নিজেদেরসহ দেশের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে উন্নয়নকল্পে তার অংশগ্রহণ যে অত্যন্ত জরুরী তার বোধ সৃষ্টি করা। তাদের উপলব্ধি করানো যে বর্তমান কর্মপন্থা এবং পদ্ধতিগুলিই ভবিষ্যৎ তৈরির জন্যই দায়ী — ভবিষ্যৎ কারও দান নয়, এটা তার

নিজের হাতেই গড়া। সেই কারণে ভবিষ্যতের লাগামও তাদেরই হাতে। এই সাংবাদিকতা মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করে। আর বোঝাতে সাহায্য করে ভবিষ্যৎ যেমন তাদের অধিকার সেরকমই তাকে সার্বিক হিতে পরিবর্তন করার দায়িত্বও তাদের। ২) নতুন নতুন পরিবর্তনের অর্থাৎ, উৎপাদন, দিশা, নীতি, ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের সচেতন করা। একই সাথে অপচয় ও ধ্বংসকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করা। ৩) মানুষের অংশগ্রণে সৃষ্ট নতুন নতুন সফলতার প্রতি নজর দেওয়া এবং সেগুলি আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে জানিয়ে এই ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার উপরোক্ত আদর্শগুলি মেনে চলতে গেলে তাই সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী নজর ও গবেষণার দক্ষতা, প্রকৃতি ও সৃষ্টির নিবিড় সম্পর্ক বোঝার ক্ষমতা থাকা দরকার। একই সাথে অর্থনীতি, পরিকল্পনা, উন্নয়ন ইত্যাদির সাম্প্রতিক নীতি প্রদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা একমুখী কোন প্রতিক্রিয়া নয় — এটি উন্নয়ন পন্থা, কর্মসূচি এবং তার নীতি পদ্ধতির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরী করার হাতিয়ার। এই সাংবাদিকতা যেমন মানুষের কাছে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে যায়, আবার মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন ধারা আরও বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে প্রচার করে — সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে। ফলে সমগ্র উন্নয়ন পদ্ধতিটি বাস্তবমুখি, ফলপ্রসু ও কর্মমুখর হয়ে ওঠে।

ভুল নীতি ও পরিবর্তনের স্বার্থে এই সাংবাদিকতার কি, কেন, কখন, কোথায়, কিভাবে ইত্যাদি প্রশ্নগুলির উত্তর জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। এবং মানুষ আরও উদ্যমী পরিবর্তনের লক্ষ্যে লাগসই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে।

স্বভাবতঃই এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ,উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রচলন আমাদের দেশে খুব একটা হয়নি। প্রথমেই আসা যাক বৃহৎ সংবাদপত্র, পত্রিকাগুলির ভূমিকার প্রসঙ্গে — এগুলি বর্তমানে এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভগুলির একটি হওয়ার পরিবর্তে হালকা, চটুল, রাজনৈতিক বিষয় গুলি (যা সাধারণ মানুষ খায়) এইসব পত্রিকায় প্রাধান্য পায় বেশি। রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এই সব পত্রপত্রিকায় উন্নয়ন সংক্রান্ত খবরাখবর মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হলেও, তাতে রাজনৈতিক রঙ চড়ানো হয়।

অন্য দিকে গ্রামগঞ্জ থেকে যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলিতে উন্নয়ন সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশ প্রায় হয়না বললেই চলে। এদের বাধা অনেক বেশি। কেউ সখের বা কেউ ব্যবসার খাতিরে এই পত্রিকা প্রকাশ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসর, লোকবল, অর্থবল ইত্যাদির অভাবে ইচ্ছে থাকলেও অনেকেই সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না।

তবে যে সব পত্রিকা নির্দিষ্ট বিষয় বিত্তিক (অর্থাৎ, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি) তারা উন্নয়নমূলক খবর প্রকাশ করলেও তাদের আবার উন্নয়ন সংক্রান্ত খবরের গুণগত ঘাটতি থাকে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সাধারণতঃ কৃষি পত্রিকাগুলি কৃষিজ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার গবেষণা ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এগুলি জরুরী মনে হলেও, কিন্তু এরকম বহু তথ্য চাষি বা পাঠক প্রয়োগ করে দেখে না। কারণ তাতে চাষির চাহিদা বা আশা আকাঙ্খার সঙ্গে অথবা তার ভূমি, শ্রম, পুঁজি, পরিকাঠামো এবং অনান্য বিভিন্ন সম্পদ থাকে, তার সঙ্গে মেলে না

বা খাপ খায় না।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, কৃষি সংক্রান্ত বেশিরভাগ গবেষণা অংশভাগী হয় না অর্থাৎ এতে চাষির ভূমিকা খুবই নগণ্য। গবেষকরা যে দৃষ্টিতে চাষির বা চাষের সমস্যা দেখে, তার উপর নিজেদের চিন্তা ধারা বা কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে গবেষণা করে। প্রযুক্তিবিদদের এই সব গবেষণাগুলিও হয় একবর্গা। অর্থাৎ প্রযুক্তি গুলির জন্য সার্বিক কি ক্ষতি বা লাভ হচ্ছে তাও ক্ষতিয়ে দেখা হয় না। এই সব গবেষণালব্ধ তথ্য যখন কৃষি পত্রিাকাগুলির মাধ্যমে চাষির কাছে যায় তখন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আরও একটি বিপজ্জনক দিক হল, আমরা ভাবি গ্রামীণ মানুষ তাদের উন্নতির জন্য দরকারী বিষয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ। এক্ষেত্রে আলোকপ্রাপ্ত গবেষক, নীতিকার, পরিকল্পনাকারীরাই চাষি ও গ্রামীণ জনসাধারণের বুদ্ধি, মেধা ইত্যাদিকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে। এই ধরণের চিন্তাভাবনা উন্নয়ন পন্থাকেই পঙ্গু বানিয়ে দেয়।

পত্রপত্রিকাগুলি থেকে উন্নয়নের যে ধারণা পাওয়া যায় তা বেশ অস্পষ্ট। সাধারণত আয় এবং সম্পত্তির সৃষ্টিকেই তারা উন্নয়নের মাপকাঠি বলে ধরে নেয়। কিন্তু উন্নয়নের অর্থ এর থেকে অনেক ব্যাপক। শুধু একমুখি গবেষণার খবরাখবর প্রকাশ করলে লাভের লাভ প্রায় হয় না বললেই চলে। কারণ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নিস্ক্রিয় গ্রাহকদের কাছে বাণী, উপদেশ, প্রস্তাব, সুপারিশ, অনর্গল গেলেও গ্রাহকদের উপকারে লাগে না।

এটা বেশ পরিষ্কার এবং স্বীকৃত ধারণা যে, উন্নয়নের কাজ যদি শুরু করতে হয় এবং তাকে টিকিয়ে রাখতে হয় – তবে সাধারণ মানুষকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের বুঝতে হবে —

০ যে সাধারণ মানুষ নিজের ও সমাজের উন্নয়নের কর্মসূচি নিতে সক্ষম।

০ তারা তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানে অথবা তারা তাদের অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ করতে পারে। একাজে তাদের কিছুটা সহায়তা দরকার, কিন্তু কোন 'প্রেসক্রিপশান' দরকার নেই।

০ তাদের চাহিদা অনুযায়ীই, গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগুলি ব্যবহৃত হবে, তাদের হাতিয়ার হিসাবে।

---

৫৯ পৃষ্ঠার পর

সব হারায়ে চন্দ্রধরে ভিক্ষায় নাহি মন। পট আঁকিয়ের হবে কেন ভিখারী জীবন।।
লোকে ভাবে ভিক্ষা লোভে ধান্দার উপায়। ধান্দা মনে বান্দাজনে পটের লেখায়।।
ব্যঙ্গ ক'রে রঙ্গভরে বান্ধি সেই জন। পটুয়ার পুরানো পট তাজা ক্ষণে ক্ষণ।।
পটুয়াগণ বাঁধে গান মরম কথায়। ঘরে ঘরে ক্ষতি করে যত মন ব্যথায় ।।
সমাজের ভাবনা ভাবে যেই শিল্পীগণ। সেখানের কেউ তারে না করে নিধন।।
পটুয়াসব মিলে করে শিল্পী সংগঠন। পথের সন্ধানে তাই যাত্রা নিরূপণ।।
পট আঁকে শিল্পীগণ সমস্যার ধরণ। দিকে দিকে পথ পায় চিহ্নিতকরণ।।
গোষ্ঠীতরে ঠিক করে সিদ্ধান্ত গঠন। সম্মান বাঁচায়ে করে সমাজ উন্নয়ন।।
এতদিনে পেয়েছি রে বাঁচার চেতন। পটুয়া জীবন হয় এই বিবরণ।।

আবুল বাসার ও 'ঢিল' গ্রন্থ

আনসার উল হক

সাহিত্য জগতে আবুল বাসার হালদার এক সুপরিচিত নাম। জন্ম ১৯৫৫ এর ১৪ নভেম্বর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার সংগ্রামপুরে। পিতা ওমর আলি হালদার আর মাতা হাজেরা বিবির আশীর্বাদ ধন্য এই লেখক ছোটদের সাহিত্যে যেমন নিবেদিত প্রাণ, বড়দের সাহিত্যেও মুনশিয়ানার দাবিদার। সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের ডালি। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'মঞ্জরী'; ছড়াগ্রন্থ 'ছড়ার ছড়ি', 'আলোর শিশু', 'হাসছে ওরা', 'ছড়ারপাখির ছানা', জীবনীগ্রন্থ 'জীবন চরিত' এবং গল্পগ্রন্থ 'বুমেরাং' বহু আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এবার তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে নানান ধরনের চোখা চোখা গল্প। এসব গল্পে যেমন বাউলের সুর বাজে, তেমনি স্বপ্নের নকশি কাঁথা জড়ানো থাকে গল্পের শরীর জুড়ে। এখনকার 'ঢিল' গ্রন্থে ১৪টি গল্পই যেন ঝিকমিকানো হীরের কুচি। গল্পের ফাঁকে তিনি যে জীবনের খণ্ডচিত্র এঁকেছেন, তা ছোট ছোট আয়নার মতো বর্তমান সমাজের নানান প্রবণতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করেছে। প্রতিটি দৃশ্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিরচেনা ঘটনা। কিন্তু উদাসীন চোখে তা দেখেও দেখিনি। লেখক আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সেগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থ শিরোনাম গল্প 'ঢিল' এর মধ্যে পবিত্র প্রেমের স্পর্শে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় নিজের মধ্যে। 'লাইটার' গল্পে টানটান উত্তেজনায়, শুক্লা একাদশীর চাঁদ সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার গিলতে গিলতে রিভলভার হয়ে যায় লাইটার। 'করিম ডাকাত' তো ডাকাত নয়, সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁর হৃদয় জুড়ে সহানুভূতি, দানশীলতা আর অদ্ভুত উপচিকীর্ষা। যা সমাজকে ভাবতে শেখায়। 'আগন্তুক' গল্পটি পড়লে সুখ ভাগ হয়ে দ্বিগুণ হয় আর দুঃখ ভাগ হয়ে অর্ধেক হয়ে যায়। ভুল বোঝাবুঝির পরিসমাপ্তিতে পাই জীবনের স্পন্দন, প্রাণের আনন্দ এ রকম সব ভালো ভালো গল্প আমাদের দিনানুদৈনিক খণ্ডজীবনের স্তর স্তরান্তরের বাস্তবকে হাজির করে নাকের ডগায়, বহির্বাস্তবকে শৈল্পিক বাস্তবে উত্তীর্ণ করতে পুরোপুরি সক্ষম। দুরন্ত শব্দকল্প, চিত্রকল্পের সঙ্গে চরিত্রের সাযুজ্য প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসে আপন আঙ্গিকে। তাই সাহিত্যিক আবুল বাসারের গল্পগুলো সময়ের প্রেক্ষিতে আদর্শবোধে জারিত হয়ে পৌঁছে যায় পাঠকের মননে। তাঁর এই আত্মকথনের শিল্প 'ঢিল' বোধকে পুষ্ট করে মেধাকে আন্দোলিত করে।

---

২৭ পৃষ্ঠার পর

নগরী। গুমঘর। পাথর দরজা, লালবাঁধ; রূপসাগর -মালদহ। রূপ গোস্বামীর বাসস্থান ও দিঘি; হাজারদুয়ারী - মুর্শিদাবাদ। প্রাসাদ নির্মাণ করেন বাংলার নবাব নাজিম হুমায়ুন খাঁ ১৮২৯ থেকে ১৮৩৭।

জেলা গ্রন্থাগার হবে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়
একটি উদ্যোগ – বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে পরিকল্পনা

জেলা গ্রন্থাগারে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আয়োজিত জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সরকারি অনুষ্ঠানে মূক ও বধির সদস্যদের বিশেষ পরিবেশন জেলা জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত পরবর্তী কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সদস্যদের অভিভাবকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী ও নিশিকান্ত সামন্ত এবং অঞ্জন কুমার বেরা গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ আলোচনা করেন।

উক্ত আলোচনা থেকে এঁদের সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের জন্য কিছু ভাবনা এবং নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা রূপায়ণের বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তব্য উঠে আসে ও নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমস্যা ঃ

১) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এই সব শিশুদের ও তাঁদের অভিভাবকদের জন্য অবিলম্বে Special Educator-এর ব্যবস্থা করা দরকার। অভিভাবকরা জানান যে এ বিষয়ে আগে যেরকম কথা হয়েছিল সে অনুযায়ী সপ্তাহে একদিন করে শিক্ষণের ব্যবস্থা করলে উপকার হবে।

২) গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে কিছু গ্রন্থাগার সুহৃদদের এই শিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে বিশেষ সদস্যদের গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা সৃষ্টি করা যাবে।

৩) এই সদস্যরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রে যে সহায়তা পাওয়ার কথা তা পাচ্ছেন না সে কারণে আগ্রহী কিছু অভিভাবক ও বিদ্যালয় শিক্ষকদের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের পাঠ দেওয়া গেলে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক অসুবিধা দূর করতে সাহায্য করতে পারবেন।

৪) একটু বড় ছাত্রছাত্রীরা ছোটদের পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারবেন নিজেরা উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারলে।

৫) অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাশ ও চর্চার জন্য জেলা গ্রন্থাগারে একটি ঘরের ব্যবস্থা করার জন্য পরিচালন সমিতিতে আলোচনা দরকার।

৬) একটি প্রকল্পের মাধ্যমে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত বা টিফিন খরচ বাবদ কোনো ভাতার ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য কি কি শর্ত আছে তা পরীক্ষা করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

পরবর্তী অংশ চতুর্থ মলাটে

GRAMONNAYAN KATHA RNI-WB BEN/2000/1984
April- June 2018 18th Year Vol.-4 Rs. 25

তৃতীয় কভারের পর

পরিকল্পনা ঃ

১) এই সদস্যদের গত ২১ তারিখে অনুষ্ঠানে পরিবেশনার মানের ভিত্তিতে যদি এদের নিয়ে কোনো নাটকের বা নাচের দল গড়ে তোলা যায় তাহলে তা তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে এবং তাদের নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করবে। সেক্ষেত্রে তাঁদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীরও বদল হবে। এজন্য –

- জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের মাধ্যমে এই দলটিকে নথীভুক্ত শিল্পীদলের মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- তাঁদের নিয়মিত আয়ের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে।
- এজন্য নাট্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।
- সরকারি প্রকল্পের আওতায় রেখে সমগ্র বিষয়টির ব্যয়ভার নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

২) এই সদস্যদের কম্পিউটারে শিক্ষণের ব্যবস্থা করে কোহা সফটওয়্যারে সদস্য ডাটা এন্ট্রি করার পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য অধিকারে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, সেটি টাকার অভাবে অনুমোদন পেতে দেরি হচ্ছে, তবে মৌখিকভাবে আশ্বাস পাওয়া গেছে প্রয়োজনে টাকা দেওয়া হবে।

অগ্রগতি ঃ

১) ২৩ এপ্রিল থেকে ৫ মে ২০১৮ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এইসব সদস্যকে কম্পিউটার শিক্ষণ দেওয়া হয় ও ৮ মে থেকে এঁরা ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করেন। এখনো কাজ করছেন। প্রতি ডাটা এন্ট্রির জন্য এঁদের ৮ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে তাঁদের চা ও টিফিন দেওয়া হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত তাঁরা নিয়মিত ভাবে এই কাজ করছেন। তাঁরা মিলিতভাবে ৬০০এর বেশি সদস্য তথা কম্পিউটারে কোহা সফটওয়্যারের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২) কয়েকজন নাট্যকর্মীর সঙ্গে এঁদের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য কথা বলা হয়েছে।

'গ্রামোন্নয়ন কথা'র পক্ষে অমৃতলাল পাড়ুই, গ্রাম- আগুরালী, পোঃ- সাধুরহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৫০৪ কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক গ্রা-প-স প্রিন্টিংস, গ্রাম-আগুরালী, পোঃ- সাধুরহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৫০৪ থেকে মুদ্রিত।